কিশোর চিলার

পার্কে বিপদ

রকিব হাসান

কিশোর
মুসা
রবিন

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

BANGLAPDFBOI.COM

পরিচয়

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা–
'তিন বন্ধু'র তরফ থেকে তোমাদের স্বাগতম।
আমি কিশোর পাশা বলছি।
নতুন যারা, আমাদের পরিচয় জানো না,
তাদের জানাই, আমি বাঙালী।
আমার এক বন্ধু মুসা আমান, আমেরিকান নিগ্রো।
অন্যজন রবিন মিলফোর্ড, আইরিশ আমেরিকান।
'তিন গোয়েন্দা' হিসেবে আমরা পরিচিত।
আমাদের মূল ঘাঁটি আমেরিকার রকি বীচে।
রহস্য ও অ্যাডভেঞ্চারের খাতিরে যে কোন জায়গা,
যে কোন শহর, যে কোন সময়ে, এমনকি যে কোন গ্রহেও
চলে যেতে পারি আমরা।
পুরানো পাঠকরা, দয়া করে 'চিলার'-এর সঙ্গে
'থ্রিলার'-কে গুলিয়ে ফেলো না।
এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা সিরিজ। এ বইয়ে মনে হবে
অনেক কিছুই উদ্ভট, অবাস্তব, অতিপ্রাকৃত।
কিন্তু কি প্রয়োজন চুলচেরা বাস্তব বিশ্লেষণের–
মজা পাওয়াটাই আসল কথা, তাই না?

এক

গ্রীন মনস্টারস ফ্রম দি মার্স!'

'ডেভিল অক্টোপাস ভার্সাস দি এভিল ক্র্যাব!'

'দা ড্রাগন ভ্যাম্পায়ার!'

ছবিগুলো কি তোমাদেরও পছন্দ?

তিন গোয়েন্দার পছন্দ, তাতে কোন সন্দেহ নেই; বিশেষ করে মুসার। ভয়ের ছবি যে খুব একটা পছন্দ করে ওরা তা নয়। তবে এগুলো করে। কারণ এগুলো বানিয়েছেন জিম হ্যাগেন। আর ফিল্ম মেকার জিম হ্যাগেনকে কে না পছন্দ করে।

প্রতি সপ্তাতে তাঁর বানানো টিভি শো 'টেরর ক্যাসল' সিরিজটা অবশ্যই দেখে ওরা। সিনেমা হলে জিম হ্যাগেনের ছবি এলে দেখতে যায়। ভিডিওতে মুক্তি পেলে কিনে আনে। মোট কথা জিম হ্যাগেনের ভক্ত ওরা।

গত শীতে একদিনের কথা। গ্রীনহিলসে রয়েছে তখন কিশোররা। লিভিং রুমে ঢুকলেন রাশেদ পাশা। তিন গোয়েন্দাকে বসে থাকতে দেখে মুখে চওড়া হাসি ফুটল। 'এই যে, আছো সবাই। কিশোর, দেখ্ তো পছন্দ হয় কিনা।'

পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা ব্রশুয়ার বের করে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

খুলল কিশোর। ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা: জিম হ্যাগেন'স টেরর ক্যাম্প।

চমকে গেল কিশোর। 'তিনি সামার ক্যাম্প খুলেছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ পাশা।

রবিন আর মুসার নাকের সামনে ব্রশুয়ারটা ধরে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'দেখো দেখো!' চাচার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তারমানে আসছে গ্রীষ্মে যাচ্ছি আমরা ওখানে?'

আবার মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ পাশা।

আনন্দে লাফাতে শুরু করল কিশোর। তার সঙ্গে যোগ দিল রবিন আর মুসা। কিছুই না বুঝে টিটুও লাফাতে লাগল। চিৎকার-চেঁচামেচি। পুরো বাড়িটা মাথায় তুলল। রান্নাঘর থেকে কি হয়েছে দেখতে এসে সব শুনে মেরিচাচীও হাসতে লাগলেন।

দারুণ একটা আনন্দের মুহূর্ত।

'দেখি তো, কি লিখেছে!' কিশোরের হাত থেকে টান দিয়ে নিতে যাচ্ছিল মুসা, লাফিয়ে এসে পড়ল টিটু। গেল ছিঁড়ে কাগজটা।

'আরে আস্তে, আস্তে,' হাসতে হাসতে চাচা বললেন।

'একেবারে টেরর ক্যাম্পের উপযুক্ত জিনিস,' মেরিচাচী বললেন। 'তিনটে নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য বেয়াড়া দানব। আর ওই কুত্তাটাও কম না।'

লাফালাফি, চিৎকার কমে এলে ব্রশুয়ারের পাতাগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে টেপ দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিলেন চাচা।

'অত খুশি হোসনে, কিশোর,' ব্রশুয়ারটা কিশোরের হাতে দিতে দিতে চাচা বললেন। 'ক্যাম্পটা কিন্তু আমার কাছে বিশেষ সুবিধের লাগছে না। নামটাই ভয়ের। গিয়ে আবার ভয়-টয় না পাস।'

চোখ উল্টে দিয়ে ভয় পাবার ভঙ্গি করল কিশোর, 'বটেই তো। কি যে বলো না তুমি, চাচা...'

মুসা কিন্তু গুরুত্ব দিল ব্যাপারটাকে। 'ভূতটুত নেই তো, আঙ্কেল?'

হেসে জবাব দিলেন রাশেদ পাশা, 'তা কি করে বলি? টেরর ক্যাম্প নামটাই ভয়ের। ব্রশুয়ার পড়লেই তো জানতে পারবে, কি কি আছে।'

ব্রশুয়ারটার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজনে। এতটাই উত্তেজিত, কথা সরছে না মুখ দিয়ে।

সব কিছুই আছে ক্যাম্পটাতে। ভূতুড়ে বন, দানোর দীঘি...

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করব কি করে?' রবিন বলল।

'মনে হচ্ছে চোখ বুজি, তারপর মেলেই দেখি গরম এসে গেছে,' মুসা বলল।

বিপদটা তখনও বুঝতে পারেনি ওরা। যা ভেবেছে, তা নয় টেরর ক্যাম্প। একটু অন্য রকম।

দুই

'বাপরে!'

চিৎকার করে উঠল কিশোর আর মুসা। প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকি খেয়েছে আরেকবার বাস। সীট থেকে আধ হাত লাফিয়ে উঠেছে দু'জনে।

'কি মনে হয়,' পেছনের সীট থেকে বলে উঠল রবিন। 'এ বাসটার ডিজাইনও কি জিম হ্যাগেনই করেছেন?'

তার পাশে বসেছে ফারিহা। একনাগাড়ে বাবল্‌গাম চিবাচ্ছে। বেলুনের মত ফুলাতে গিয়ে ঠাস করে ফাটছে। ছিটকে এসে লাগছে মুসার মাথার পেছনের চুলে। 'সরি' বলছে। খানিক পরেই ভুলে গিয়ে শুরু করে দিচ্ছে আবার। মোট কথা, ফুর্তিতে আছে।

'বাসটার নাম দানবের বাহন রাখলে কেমন হয়?' মুসা বলল।

'উঁহু। শয়তানের বাহন,' রবিন বলল।
'সবচেয়ে ভাল হয়,' ফারিহা বলল, 'মৃত্যুযাত্রা ।'
কিশোর আর মুসা দু'জনেই ফিরে তাকাল ওর দিকে।
'বাহ্, দারুণ নাম। এইটাই ঠিক,' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'এমন নাম জিম হ্যাগেনও রাখতে পারেননি।'
এত সরাসরি প্রশংসায় লজ্জা পেল ফারিহা।
সাঁই করে তীক্ষ্ণ মোড় নিল বাস। দুই ধারে সমভূমি। মাইলের পর মাইল শুধু সবুজ খেত আর খেত। আর কিছু নেই।
'আর কতদূর?' বাসের পেছন থেকে বলে উঠল একটা ছেলে।
'আর কতদূর! আর কতদূর! আর কতদূর!' সুর করে সবাই মিলে জারি গান জুড়ে দিল যেন।
মাঠ শেষ হয়ে গিয়ে দেখা দিল লম্বা লম্বা গাছপালা। বাঁক নিয়ে ঘন বনে ঢুকে গেল মহাসড়ক।
'রোজ রাতেই একটা করে জিম হ্যাগেনের সিনেমা দেখাবে,' মুসা বলল। 'দারুণ হবে, তাই না?'
'সব ছবিই দেখা আছে আমার,' জবাব দিল রবিন। 'প্রতিটা ছবি অন্তত আধ ডজনবার করে দেখেছি।'
'কিন্তু আমি আবার দেখতে চাই,' মুসা বলল।
উদ্বিগ্ন মনে হলো ফারিহাকে। 'সবগুলোই কি ভয়ের? ভয়ের ছবি আমি দেখতে পারি না। ভয় পেলে ক্যাম্পে যাওয়ার আনন্দই মাটি হবে আমার।'
'ভয়েরই ক্যাম্প ওটা,' মুসা বলল। 'নামে বোঝো না...'
কথা শেষ হলো না তার। ভয়ানক আরেক ঝাঁকুনি। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল ড্রাইভার। চিৎকার করে উঠল কেউ। কেউ বা হাসতে লাগল।
পড়েই গিয়েছিল কিশোর। টেনেটুনে সীটের ওপর তুলে বসাল আবার নিজেকে।
আবার ব্রেক কষার ঝাঁকুনি। আরেকবার সীট থেকে পিছলে নেমে যাওয়া। ড্রাইভারের রাগত চিৎকার।
জোরে জোরে হাঁপানোর শব্দ। সামনের দরজার কাছে।
কোনমতে সীটে উঠে বসে ঘুরে তাকাল কিশোর।
জোর করে ঢুকছে একটা লোক। আগাগোড়া কালো পোশাকে মোড়া। মুখে কালো মুখোশ। মাথায় চওড়া কানাওয়ালা কালো হ্যাট। গায়ে কালো সোয়েটশার্ট। পরনে কালো প্যান্ট।
'অ্যাই...অ্যাই, এখানে কি?' ধমকে উঠল ড্রাইভার।
গোঁ গোঁ করে কি যেন বলল লোকটা। বুঝতে পারল না কিশোর।
'জলদি নামো! এক্ষুণি!' ধমক দিয়ে বলল আবার ড্রাইভার।
লাফ দিয়ে ড্রাইভারের পেছনে চলে গেল লোকটা। কালো দস্তানা পরা

হাত বাড়িয়ে দিল। শার্টের কলার চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে সীট থেকে তুলে নিয়ে এল তাকে।

'অ্যাই অ্যাই, কি করছ?' ভীষণ রেগে গেল ড্রাইভার। বেঁটে-খাটো রোগাটে বুড়ো মানুষ সে। মাথায় সাদা চুল। চোখে কালো চশমা। তারপরেও ধস্তাধস্তি শুরু করল লোকটার সঙ্গে। তাকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল বাস থেকে।

চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করল ছেলেমেয়ের দল। কিন্তু তিন গোয়েন্দা আর ফারিহা চুপ। স্তব্ধ।

বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে কিশোরের। যতটা না ভয় তারচেয়ে বেশি উত্তেজনায়।

ঘটনাটা কি?

ধস্তাধস্তি করতে করতে বাসের একপাশের দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল দু'জনে। তারপর গিয়ে পড়ল সামনের কাঁচের ওপর। টকটকে লাল হয়ে গেছে ড্রাইভারের মুখ। তার গলা টিপে ধরেছে কালো পোশাক পরা লোকটা।

'পালাও তোমরা! পালাও!' কোনমতে বলল ড্রাইভার। 'জলদি!'

কেউ নড়ল না।

আতঙ্কিত হয়ে দেখল সবাই, ড্রাইভারকে ধরে উঁচু করে ফেলেছে বিশালদেহী লোকটা। নিয়ে গেল দরজার দিকে। বাইরে ফেলে দিল। মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে গেল বেচারা ড্রাইভার।

তাকিয়ে আছে কিশোর। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। কালো পোশাক পরা লোকটার দিকে ফিরল।

দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল লোকটা। ড্রাইভিং সীটে গিয়ে বসল।

চাকার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে মূল রাস্তা থেকে নেমে একটা কাঁচা রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করল বাসটা।

উঁচু হয়ে থাকা মাটির ঢিপিতে ঝাঁকি খেয়ে কয়েক হাত ওপরে লাফিয়ে উঠল যাত্রীরা। ছাতের নিচে দেয়াল ঘেঁষে রাখা ক্যারিয়ারে গিয়ে বাড়ি খেল কিশোরের মাথা। মুসার কপাল ঠুকে গেল সামনের সীটের পেছনে। একে অন্যের গায়ে গিয়ে পড়ল রবিন আর ফারিহা।

চিৎকার করছে ছেলেমেয়ের দল। বেশি ছোট কেউ কেউ কাঁদতে শুরু করেছে।

'থামান! থামান! বাস থামান!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

উঠতে গেল মুসা। এক পাশে মোচড় খেল বাসের বডি। কাত হয়ে পড়ে গেল সে। পড়ে গেল আরও কয়েকটা ছেলেমেয়ে। দুই সারি সীটের মাঝখানে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

হই-হট্টগোল, অনুরোধের পরোয়াই করল না ড্রাইভার। সীটের ওপর

কুঁজো হয়ে বসে শক্ত করে চেপে ধরেছে স্টিয়ারিং।

গতি বাড়িয়ে চলল সে।

'কে লোকটা?' চিৎকার করে বলল রবিন। 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের?'

তিন

হর্ন বাজাতে বাজাতে গর্জন করে পাশ দিয়ে বিপুল গতিতে চলে গেল একটা ট্রাক। সাঁই করে স্টিয়ারিং কাটার ফলে আবার একপাশে কাত হয়ে গেল বাস। আরেকবার সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেমেয়ের দল।

হঠাৎ হাসতে শুরু করল কিশোর।

'পা-পা-প্পাগল হয়ে গেলে নাকি?' তোতলানো শুরু করল মুসা।

'বুঝতে পারছ না?' হট্টগোল ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল কিশোর। 'পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। অভিনয়। যেহেতু টেরর ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে করে করছে এ সব। ভয় দেখানোর জন্যে।'

সামনের সীটের পেছনটা আঁকড়ে ধরে সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে দিল রবিন আর ফারিহা। কিশোর কি বলে শোনার জন্যে।

'তার মানে?' হাঁ হয়ে গেছে মুসা।

'তাই তো!' উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'কেন, মনে নেই? ক্যাম্প ভ্যাকেশন ছবিটার কথা? অবিকল এ রকম একটা কাণ্ড ঘটেছিল। একটা খেপা জম্বি বাসসুদ্ধ যাত্রীকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছিল। চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছিল বাস ভর্তি ছেলেমেয়েরা। ঠিক এ রকম করে।'

'তাই তো!' নিজের উরুতে চড়াৎ করে এক চাপড় মারল মুসা। ভয় দূর হয়ে গেল চেহারা থেকে। হাসি ফুটল।

ফিরে তাকিয়ে রবিন আর ফারিহাকেও একই কথা বলল কিশোর। 'পুরোটাই নাটক, বুঝলে। ভয় দেখিয়ে মজা দিতে চাইছে। মনে হয় ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা।'

আবার বাঁক নিল বাস। বাস থামানোর জন্যে ড্রাইভারকে অনুরোধ করতে লাগল কেউ কেউ।

'আমার কাছে কিন্তু নাটক মনে হচ্ছে না,' রবিন বলল।

'টেরর ক্যাম্প, ভুলে গেছ? নামেই আতঙ্ক যার, ভয় তো দেখাবেই।'

'কিন্তু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে না?' মানতে পারছে না রবিন।

সীটের ওপর শক্ত হয়ে বসে আছে ফারিহা। দুই হাতে সীটের কিনার আঁকড়ে ধরেছে। চোখ বোজা।

'আমি বলে দিলাম পুরোটাই একটা খেলা, দেখো,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল

কিশোর। 'সোজা ক্যাম্পের মধ্যে নিয়ে গিয়ে গাড়ি ঢোকাবে ড্রাইভার। তারপর টান দিয়ে মুখোশ খুলে হাসতে হাসতে বলবে: টেরর ক্যাম্পে স্বাগতম।'

'আরি! মনে তো হচ্ছে ঠিকই বলেছ তুমি,' জানালা দিয়ে তাকিয়ে বলে উঠল মুসা।

তীব্র গতিতে ছুটছে বাস। ঝিলিকের মত দেখা যাচ্ছে পাশ দিয়ে চলে যাওয়া গাছগুলোকে। বিশাল একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। তাতে আঁকা মাথাকাটা এক ভূতের ছবি। পাশে লেখা: জীবনের শেষ সীমানায় স্বাগতম! লাল রঙে লেখা শব্দগুলো দেখে মনে হয় তাজা রক্ত দিয়ে লেখা। পুরানো শ্যাওলার রঙে আঁকা একটা তীরচিহ্ন সোজা সামনের দিকে নির্দেশ করছে।

'দেখলে?' কিশোর বলল। 'ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। আমি জানতাম।'

'সত্যি তাই মনে হচ্ছে তোমার, কিশোর ভাই?' ফারিহা বলল।

'নিশ্চয়,' বাসের জানালা দিয়ে বাইরে দেখাল কিশোর। 'ওই যে দেখো, ঢোকার পথ।'

সবুজ তীরচিহ্নটার দিকে তাকাল ওরা। চওড়া একটা ড্রাইভওয়ের দিকে নির্দেশ করছে। সেখানে আরেকটা সাইনবোর্ড: এদিক দিয়ে ঢোকো।

'ঠিক বলেছ!' চিৎকার করে উঠে কিশোরের কাঁধে চাপড় মারল মুসা।

আচমকা নীরব হয়ে গেল বাসের ভেতরটা। সবাই তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে। অপেক্ষা করছে মুখ ঘুরিয়ে বাসের ক্যাম্পের মধ্যে ঢোকার।

কাছে আসতেই চোখের সামনে বিশাল হয়ে উঠল সবুজ তীরচিহ্নটা। পরক্ষণে জানালার পাশ দিয়ে সাঁ করে সরে চলে গেল।

'আরে আরে, পার হয়ে যাচ্ছেন তো!' চেঁচিয়ে উঠল একটা ছেলে।

'মোড় না নিয়ে সোজা যাচ্ছেন কেন?' কিশোর বলল।

'ঘুরুন! ঘুরুন! ফিরে যান!' চেঁচিয়ে উঠল কয়েকটা ছেলেমেয়ে।

প্রবেশ পথটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। বাস সরে যাওয়ায় দ্রুত ছোট হয়ে আসতে লাগল চওড়া মুখটা। আরেকটা ঢিবিতে ঝাঁকি খেয়ে লাফিয়ে উঠল বাস।

স্টিয়ারিঙের ওপর ঝুঁকে থেকে লাউডস্পীকারের সুইচ অন করল ড্রাইভার। গমগম করে উঠল তার শয়তানি ভরা কণ্ঠ, 'চুপ করে বসে থাকো সবাই। ক্যাম্পে যাচ্ছি না আমরা। তোমাদেরকে নিয়ে অন্য পরিকল্পনা আছে আমার।'

চার

আবার শোনা যেতে লাগল চিৎকার-চেঁচামেচি-হট্টগোল। আতঙ্কিত হয়ে চেঁচাতে লাগল ছেলেমেয়েরা:

'বেরোতে দিন আমাদের!'

'বাস থামান! থামান বলছি!'

'আরে থামাচ্ছেন না কেন? কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল মুসা আর কিশোর। অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে। সত্যিই নাটক কিনা বুঝতে পারছে না আর এখন। ক্যাম্প থেকে যতই দূরে সরে যেতে লাগল বাস, সন্দেহটা বাড়তে থাকল ওদের।

সীট আঁকড়ে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে দু'জনে। এত জোরে লাফাচ্ছে কিশোরের হৃৎপিণ্ড, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। রবিন কিংবা ফারিহা কি করছে, তাকানোর মত অবস্থাই নেই তার।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ও?' বিড়বিড় করল মুসা।

কিশোর কোন জবাব দেয়ার আগেই ঘুরে গেল বাসের মুখ। ডানে ছিটকে পড়ল সবাই। তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে একটা খোয়া বিছানো পথে নামল বাস।

চাকার নিচে খড়খড় আওয়াজ তুলছে খোয়া। দু'ধারে বন। লম্বা, অন্ধকার গাছগুলো লাফ দিয়ে দিয়ে যেন সরে যাচ্ছে জানালার পাশ দিয়ে।

'বনের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের,' শোনা গেল ফারিহার কণ্ঠ। 'গভীর বনের মধ্যে।'

কিন্তু হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল বন। লাফ দিয়ে গিয়ে একটা সবুজ মাঠে নামল বাস।

লম্বা কাঠের বেড়া চলে গেছে মাঠের বুক চিরে। তার ওপাশে পাহাড়ের ঢালে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো নিচু কেবিন আর কতগুলো বাড়িঘর।

একটা চওড়া গেট দেখা গেল। ওপরে সাইনবোর্ডে লেখা: টেরর ক্যাম্পে স্বাগতম।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'তারমানে সত্যি সত্যি ক্যাম্পে পৌঁছালাম আমরা।'

গতি কমে এল বাসের। থামল এসে একটা লম্বা কাঠের বাড়ির সামনে।

এতক্ষণে পিঠ সোজা করে বসল ড্রাইভার। লাউডস্পীকারের সুইচ অন করে দিয়ে বলল, 'টেরর ক্যাম্পে স্বাগতম সবাইকে। ভয়টা কেমন পেলে?'

'জান উড়িয়ে দিয়েছিলেন!' চিৎকার করে উঠল একজন। 'উফ্, কি কাণ্ড!'

শুরু হয়ে গেল কলরব। জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ।

হাসতে শুরু করল কিশোর। নিজের অজান্তেই বেরিয়ে আসছে হাসি। থামাতে পারছে না। আরও কয়েকজন হেসে উঠল তার সঙ্গে সঙ্গে।

পুরো বাসটায় চোখ বোলাল কিশোর। কিছু কিছু ছেলেমেয়ের মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। ফ্যাকাসে ভাবটা দূর হয়নি এখনও। কারও গালে পানির দাগ। দুটো ছোট্ট মেয়ে এখনও কাঁদছে।

'ক্যাম্পে ঢোকার এটাই আসল গেট,' ড্রাইভার জানাল। 'বড় রাস্তায় যেটা দেখলে–ফেলে এলাম, সেটা ভুয়া।'

টান দিয়ে কালো মুখোশটা খুলে নিল সে। বয়েসে তরুণ। খাটো করে ছাঁটা সোনালি চুল। ওপরের পাটির সামনের দুটো দাঁত ঠেলে বেরিয়ে আছে খরগোশের মত।

'ভয়টা ঠিকমত দেখাতে পেরেছি তো?' হেসে জিজ্ঞেস করল সে আবার। 'এটা সবে শুরু।' হাসিটা বাড়ছে তার। 'আরও যে কত শত ভয়ের ব্যাপার রয়েছে এখানে, কল্পনাও করতে পারবে না।'

*

বেড়াতে আসা ক্যাম্পারদের স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন কাউন্সেলর। সবার পরনে সবুজ প্যান্ট, সবুজ টি-শার্ট। গাছের গোড়ায় লেগে থাকা আঠাল শ্যাওলার মত সবুজ।

বাস থেকে লাফিয়ে নেমে হাত-পা টান টান করল কিশোর। তাজা বাতাস টেনে নিল বুক ভরে।

অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মুসা, রবিন আর ফারিহা আগেই নেমে পড়েছে। সবার সঙ্গে সঙ্গে সারি দিয়ে বড় কাঠের কেবিনটার দিকে এগোল সে। পার্কের মূল বাড়ি ওটা।

চারপাশে তাকাতে তাকাতে চলেছে সবাই।

ক্যাম্পটা করা হয়েছে একটা পার্কের মধ্যে।

বিনোদনের কত রকম জিনিস!

পাহাড়ের গোড়ায় চোখে পড়ল একটা স্পিন-অ্যান্ড-স্ক্রিম রাইড।

বাস থেকে নেমে আসা আরও দুটো ছেলের সঙ্গে কি যেন বলাবলি করছে মুসা। উত্তেজিত ভঙ্গিতে রাইডটা দেখাচ্ছে।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে সবাই। এখানে টেরর ক্যাম্পে বাস করা আর জিম হ্যাগেনের সিনেমার মধ্যে বাস করা যেন একই ব্যাপার।

উজ্জ্বল রোদে চোখ মিটমিট করতে করতে সারি সারি ছোট কেবিন আর বাড়িঘরের দিকে তাকাল কিশোর। সার বেঁধে চলে গেছে উপত্যকার বালির চরা আর কুচকুচে কালো পানির দীঘির দিকে।

ওটাই নিশ্চয় দানোর দীঘি, ভাবল সে।

'আজ রাতে কি ছবি দেখাবে, বলতে পারো?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল একটা ছেলে।

'সাঁতার কাটতে গেলে কেমন হয়? গরম লাগছে,' বলল আরেকজন।

'জিম হ্যাগেন কি আছেন নাকি এখানে?'

'থাকারই তো কথা। ব্রশুয়ারে তো তাই বলেছে।'

'তার সঙ্গে দেখা হবে তো?'

'পাহাড়ের গায়ে ওগুলো কি সত্যিকারের গুহা?'

চারপাশে উত্তেজিত কণ্ঠের ছড়াছড়ি। ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে করছে কিশোরের। এক সঙ্গে সব দেখে নিতে চায়। কিন্তু কাউন্সেলররা ওদেরকে লজের ভেতরে নিয়ে চলল।

রেজিস্টারে সই করতে হবে। কার কি করার ইচ্ছে, তা-ও লিখতে হবে।

রবিন আর ফারিহা রয়েছে কিশোরের ঠিক পেছনে। মুসা রয়েছে আরও কয়েকজনের পেছনে। বাস থেকে নেমে আসা ছেলে দুটোর সঙ্গেই কথা বলছে এখনও।

প্রচুর কাগজপত্র সই করতে হলো ওদের।

অবশেষে যার যার কেবিন দেখিয়ে দেয়া হলো। তিন নম্বর কেবিনে জায়গা হলো তিন গোয়েন্দার। ফারিহা যেহেতু মেয়ে, কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা হলো তার। কেবিন নম্বর নাইন।

তিন নম্বর কেবিনটা পাহাড়ের ঢালের ঠিক মাঝামাঝি। দীঘির দিকে মুখ করা। বাংক বেড আর ড্রেসারগুলো রাখা দেয়াল ঘেঁষে। বাংক আছে পাঁচটা।

রবিন বলল, 'বাকি দুটো বাংকে কে থাকবে? আমাদের রুমমেট?'

জবাব জানা নেই মুসা বা কিশোরের।

কিশোর বলল, 'এলেই বোঝা যাবে।'

ড্রয়ারে কাপড়-চোপড় ভরতে লাগল সে। জিনিসপত্র সব বের করার পর ব্যাগটা ঠেলে দিল বাংকের নিচে। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'চলো, এবার বেরোনো যাক।'

কেবিন থেকে বেরোতে গিয়েই ধাক্কা খেল ওরা একজন কাউন্সেলরের সঙ্গে। অনেক লম্বা লোকটা, গায়ে এক ছটাক মাংস নেই। এতই সরু, দেখে মনে হয় ঝুল ঝাড়ার ঝাড়ু–বাঁশের মাথায় সোনালি চুল।

'এই যে ছেলেরা,' মিষ্টি হাসি দিয়ে বলল সে। 'আমি ডেরিক। কেবিন থ্রী'র কাউন্সেলর।'

নিজেদের পরিচয় দিল তিন গোয়েন্দা।

'শোনো, এই বাংকে কেবিন থ্রী'র ছেলেরাই সাধারণত নেতৃত্ব দেয়।

তোমরাও দেবে,' ডেরিক বলল। 'রনি আর ব্যানির সঙ্গে দেখা হয়েছে? ওরা তোমাদের রুমমেট। ঘুরতে বেরোচ্ছ বুঝি? যাও। দেখে এসো।'

ডেরিককে ধন্যবাদ জানিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা।

'একটা কথা!' পেছন থেকে ডাক দিল ডেরিক।

ফিরে তাকাল ওরা।

'মৃত্যুগুহার দিকে যেও না কিন্তু ভুলেও,' ডেরিক বলল। ঝিলিক দিয়ে উঠল তার নীল চোখ। 'কেন জানো?'

'কারণ গুহায় ঢুকলে মারা পড়ব,' অনুমান করে বলল কিশোর।

হেসে উঠল ডেরিক। 'ঠিক ধরেছ।'

তারপর মলিন হয়ে এল তার হাসিটা। 'ঠাট্টা নয়। খুব সাবধান।' এদিক ওদিক তাকিয়ে কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'এই ক্যাম্প...সাদা চোখে যা দেখছ, আসলে তা নয়?'

'মানে? কি বোঝাতে চাইছেন?'

জবাব দিল না ডেরিক। আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে গট্‌গট্‌ করে হেঁটে রওনা হয়ে গেল লজের দিকে।

অবাক চোখে পরস্পরের দিকে তাকাতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা। ডেরিকের আচরণ রহস্যময় মনে হলো ওদের কাছে।

যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকে রওনা হলো আবার ওরা। ব্যাগ-সুটকেস নিয়ে কেবিনগুলোতে ঢুকছে এখনও ছেলেমেয়েরা। উত্তেজিত কথার টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে গ্রীষ্মের উষ্ণ বাতাসে।

পাহাড়ের চূড়ায় খেলা জুড়ে দিয়েছে কয়েকটা ছেলে। নয় নম্বর কেবিন থেকে বেরোতে দেখা গেল ফারিহাকে। ওদের দিকেই আসছে।

পায়ে চলা পথ ধরে বনের দিকে হাঁটতে লাগল তিন গোয়েন্দা। নিচু হয়ে থাবা দিয়ে পা থেকে একটা পোকা তাড়াল কিশোর।

সোজা হয়ে মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাতে চোখে পড়ল একটা সাইনবোর্ড। তীরচিহ্ন দিয়ে নানা দিকে নির্দেশ করা হয়েছে তাতে। ইংরেজি নামগুলোর বাংলা করলে দাঁড়ায়ঃ

ভুতুড়ে বন—সোজা সামনে।

দানোর দীঘি—ডান দিকে।

চোরাবালির কূপ—বাঁয়ে।

হারানো আত্মার খনি...মৃত্যুগুহা...গোস্ট কেবিন...

কত রকমের রোম খাড়া করা নাম। কোন্ দিকে গেলে কোন্‌টা পাওয়া যাবে নির্দেশ করা রয়েছে তীরচিহ্ন দিয়ে।

'বাপরে!' দেখতে দেখতে রবিন বলল, 'জিম হ্যাগেনের ছবি থেকে তুলে আনা ভয়ঙ্কর সব নাম।'

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে গেল কিশোর। থেমে গেল তীক্ষ্ণ এক চিৎকারে।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল তিনজনে।

চিৎকার করছে আতঙ্কিত একটা কণ্ঠ, 'বাঁচাও! বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!'

পাঁচ

বনের দিক থেকে আসছে শব্দটা।

লাল-চুল একটা ছেলেকে দেখা গেল। কিসের মধ্যে যেন আটকে গেছে হাত। গোল, সাদা একটা জিনিস।

'বাঁচাও!'

তার দিকে ছুটে গেল তিন গোয়েন্দা।

মোচড়ামুচড়ি করছে ছেলেটা।

একটা বোলতার বাসার মধ্যে আটকে গেছে হাত।

বোলতাদের রাগত গুঞ্জন কানে এল।

মোচড় দিয়ে টান মারল ছেলেটা আবার। কিন্তু হাত ছুটাতে পারল না।

'ওহ্!' গুঙিয়ে উঠল সে। 'কামড়ে শেষ করে দিল!'

ঘাস মাড়িয়ে দৌড়ে গেল তার দিকে কিশোর।

ফারিহার কণ্ঠ শোনা গেল। সে-ও আসছে ছুটতে ছুটতে।

ছেলেটাকে ঘিরে দাঁড়াল চারজনে। দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছে।

'কি হয়েছে তোমার?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'ওখানে হাত ঢোকালে কি করে?'

'কথা পরে। আগে আমাকে ছাড়াও,' ককিয়ে উঠল ছেলেটা।

আবার হাত মোচড়াতে শুরু করল সে। দরদর করে ঘামছে। চুল ভিজে কপালের সঙ্গে লেপ্টে গেছে।

জোরে আবার এক টান মারল সে। এবারও হাত ছুটাতে পারল না।

'কামড় খেয়ে এমন ফোলা ফুলেছে বেরই করতে পারছি না এখন,' গোঙাতে গোঙাতে বলল ছেলেটা।

'দেখি তো,' এগিয়ে গেল কিশোর। ভারী দম নিয়ে দুই হাতে চেপে ধরল বাসাটা। 'হ্যাঁ, টানো এবার। যত জোরে পারো।'

সাদা বাসাটার মধ্যে রাগে গুঞ্জন করছে বোলতারা।

'দোহাই তোদের বোলতা, আমাকে কামড়াসনে,' মনে মনে প্রার্থনা করল কিশোর।

গুঞ্জনটা গর্জনে রূপ নিল। হাত কাঁপছে কিশোরের। কিন্তু বাসা ছাড়ল

না। আরও শক্ত করে চেপে ধরল। চোখের পাতা আধবোজা। দেহের প্রতিটি পেশী টানটান।

'টানো। টানো। চুপ করে আছো কেন?' তাগাদা দিল কিশোর। 'আমি তো ধরেই আছি।'

হঠাৎ হাসতে শুরু কলল ছেলেটা। আলগোছে হাতটা বের করে আনল।

ওপরে তুলে ধরে দেখাল ওদের।

কোন ফোলাটোলা বা হুলের দাগ নেই।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দারা।

বোলতার বাসাটা চোখের সামনে নিয়ে এল কিশোর, ভাল করে দেখার জন্যে।

প্লাস্টিক।

ভেতরে দেখল। গুঞ্জনের শব্দ বেরোচ্ছে ভেতরে বসানো খুদে একটা স্পীকার থেকে।

'মজা করলাম,' ছেলেটা বলল। 'একটু আগে খুঁজে পেয়েছি ওটা আমি আর আমার বন্ধু।'

যত রাগ গিয়ে বাসাটার ওপর পড়ল কিশোরের। ছুঁড়ে ফেলতে গেল মাটিতে। টান লেগে ডালটা বাঁকা হয়ে গেল। বাসাটা বাঁধা রয়েছে ডালের সঙ্গে।

নিজের পরিচয় দিল ছেলেটা। ওর নাম রনি বিয়ান্ডা। পরনে কালো প্যান্ট। ধূসর টি-শার্টের বুকে রক্তের রঙে লেখা 'টেরর ক্যাম্প'।

'আজ সকালেই এসেছি আমরা,' হাত দিয়ে ডলে লাল চুল সমান করতে করতে জানাল রনি।

'কোন কেবিনে উঠেছ?' রাগটা যাচ্ছে না কিশোরের।

'কেবিন থ্রী।'

'অ। তোমরাই আমাদের রুমমেট,' তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল মুসা। 'জ্বালাবে। বুঝতে পারছি।'

'না না, জ্বালাব না,' মাথা নাড়ল রনি। 'তোমরা আমাদের রুমমেট আগে জানলে কিছুতেই তোমাদের সঙ্গে এ রসিকতা করতাম না। কিছু মনে কোরো না।...যাকগে, একটা কথা বলি। আসার পর থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছি ক্যাম্পে। কেমন যেন। সব কিছুতেই একটা ভয় ভয় ভাব। ভয় পেতে যদি ভাল না লাগে, এখুনি চলে যাও এখান থেকে।'

'ভয় পেতে একেবারেই ভাল লাগে না তা নয়,' জবাব দিল রবিন। 'নইলে এলাম কেন এখানে? জেনেশুনেই তো এসেছি, যে এটা ভয়ের জায়গা।'

'কিন্তু সব কিছুই ভুয়া নাকি এখানে?' ফারিহার প্রশ্ন। 'এই বাসাটার মত?'

রনি জবাব দেবার আগেই বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আরেকটা ছেলে। লম্বা কালো চুল পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লেজের মত করে বেঁধেছে। ব্যায়াম-ট্যায়াম করে মনে হয় পেশী আছে। পরনে ঢোলা প্যান্ট। গায়ে রনির মত টি-শার্ট, তাতে টেরর ক্যাম্পের ছাপ মারা।

'হাই,' হাত তুলে তাকে ডাক দিল রনি। তিন গোয়েন্দাকে বলল, 'ওই যে আমার বন্ধু, ব্যানি কুপার।'

'হাই,' কাছে এসে দাঁড়াল ব্যানি। চুল থেকে একটা পোকা নিয়ে টোকা দিয়ে ছুঁড়ে মারল রনির দিকে। সত্যিকারের পোকা নকল নয়।

নিচু হয়ে পোকাটাকে এড়াল রনি।

'শুরুতেই একটা ঠক খাওয়ালাম ওদেরকে,' হাসতে হাসতে বলল ব্যানিকে। 'নকল বোলতার বাসাটা দিয়ে।'

'তাই নাকি? আহ্‌হা,' আফসোস করল ব্যানি। 'মজাটা আমি দেখতে পারলাম না।'

'পুরো এলাকাটা ঘুরে দেখে ফেলেছি আমি আর ব্যানি,' রনি জানাল। নিচু হয়ে একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে শুরু করল।

'সবই কি ভুয়া নাকি এখানে?' আগের প্রশ্নটা করল আবার ফারিহা। 'সব ভাঁওতাবাজি?'

অকস্মাৎ হাসিটা মুছে গেল রনির। 'সব নয়!' জিভ দিয়ে ঘাসের ডগাটা ঠোঁটের এক কোণ থেকে আরেক কোণে সরিয়ে দিল সে।

'টেরর ক্যাম্পের আতঙ্ক সেগুলোই,' রনির সঙ্গে সুর মেলাল ব্যানি। 'ওই আসলগুলো।'

'যেমন?' জানতে চাইল মুসা।

দ্বিধা করতে লাগল ছেলে দুটো। পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে।

'এখানে দু'এক দিন থাকলে নিজেরাই সেটা জেনে যাবে,' ব্যানি বলল।

'কেন, বলতে অসুবিধে কি?' কিশোর বলল। 'কোন্‌টা কোন্‌টা আসল?'

ঠোঁটের কোণ থেকে ঘাসের ডগাটা আবার জিভের আগায় নিয়ে থুহ্ করে ফেলল রনি। আঙুল তুলে দেখাল। 'ওই যে ওটা…ওটা আসল।'

ঘাসের মাঝখানে খানিকটা জায়গায় হলুদ বালি দেখা যাচ্ছে। একটা কাঠের সাইনবোর্ড দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে বালির কিনারে, ঘাসের মধ্যে। লেখাগুলো দূর থেকে পড়া যাচ্ছে না।

'চোরাবালির কুয়া,' ব্যানি বলল।

'তাই? তারমানে তোমরা বলছ ওটা আসল?' সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল কিশোর।

রনি আর ব্যানি, দু'জনেই মাথা ঝাঁকাল।

'শুনেছি, গত হপ্তায় একজন কাউন্সেলর নাকি ভুল করে পড়ে গিয়েছিল ওটার মধ্যে,' ফিসফিস করে জানাল ব্যানি। চঞ্চল হয়ে উঠেছে দৃষ্টি। বার

বার তাকাচ্ছে চারপাশে। ভয় পাচ্ছে, অন্য কেউ শুনে ফেলবে। 'বেচারা! ভার নাকি উঠতে পারেনি। সোজা বালির তলায়।'

'যাহ্, ঠাট্টা করছ!' বিশ্বাস হলো না রবিনের।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'বানিয়ে একখান গপ্পো বলে দিলে, তাই না?' বলল সে। 'আরেকবার আমাদের বোকা বানানোর চেষ্টা।'

'নাহ্!' ভয়ে ভয়ে চোরাবালির কূপটার দিকে তাকাল রনি। অস্বস্তি বোধ করছে। 'এখন তো জেনে গেছি, তোমরা আমাদের রুমমেট। বোকা বানানোর প্রশ্নই ওঠে না আর।'

ছয়

রনি আর ব্যানি চলে গেল।

ক্যাম্পটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা। বালির চরায় গেল। দীঘিটা দেখল। কিন্তু চোরাবালির কাছে গেল না। বার বার ওটার দিকে চোখ গেল কিশোরের।

আবার কি ভাঁওতা দিল রনি?

বাস থেকে নেমে যে দুটো ছেলের সঙ্গে কথা বলেছিল মুসা, দেখা হয়ে গেল ওদের সঙ্গে।

দল বেঁধে কেবিনে ফিরে চলেছে ওরা, বাঁশি শুনতে পেল এ সময়।

বাঁশি কিসের, সবুজ ইউনিফর্ম পরা একজন কাউন্সেলরকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, মীটিঙে ডাকা হচ্ছে সবাইকে। লজ-এ বসবে মীটিং।

চতুর্দিক থেকে ছুটতে ছুটতে এল ছেলেমেয়েরা। লজের দরজা দিয়ে ঢোকার সময় রনি আর ব্যানিকে চোখে পড়ল কিশোরের। হাত নাড়ল ওদের দিকে।

লজ বাড়িটা পুরোটাই কাঠের তৈরি। দোতলা। অনেক বড়।

বাঁয়ে লম্বা হলওয়ের ধারে এক সারি ছোট ছোট ঘর দেখতে পেল কিশোর।

বিশাল একটা হলঘরে নিয়ে আসা হলো ওদের। ওটার দুই প্রান্তে দুটো পাথরের ফায়ারপ্লেস। ঘরের মাঝখানে লম্বা লম্বা অনেকগুলো কাঠের টেবিল। সাইনবোর্ডে লেখা: মেস হল ও মীটিং রুম।

একপাশের দেয়ালে লাগানো জিম হ্যাগেনের সিনেমার পোস্টার। বিখ্যাত ছবিগুলোর।

লম্বা টেবিলগুলোতে ছেলেমেয়েদের বসতে ইশারা করল কাউন্সেলররা। দ্বিতীয় সারির টেবিলগুলোতে কয়েকজন বেশি বয়েসের ছেলের পাশে বসার

জায়গা করে নিল কিশোর।

ওদের সঙ্গে কথা বলতে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গে লম্বা একজন কুস্তিগীরের মত কাউন্সেলর সামনে এসে দাঁড়াল। বাজখাঁই কণ্ঠে হুকুম দিল, 'দুই হাত টেবিলের ওপর রাখো সবাই। জলদি! হাত টেবিলের ওপর!'

চমকে গেল কিশোর, যখন টেবিলের নিচ থেকে টেবিলের সঙ্গে লাগানো মোটা কালো তার বের করে ওর কব্জিতে পেঁচিয়ে বাঁধল লোকটা। সবারই হাত ওরকম করে আটকে দিতে লাগল কাউন্সেলররা। এবং তখনই এর কোন ব্যাখ্যা দিল না।

'হাতকড়া নাকি?' চিৎকার করে উঠল একটা ছেলে।

'অ্যারেস্ট করা হয়েছে আমাদেরকে?' বলে উঠল আরেকজন।

রসিকতা মনে করে হেসে উঠল কয়েকজন।

কিন্তু কিশোরের কাছে ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

হঠাৎ মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল তারগুলোর ভেতর, হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে যাবার মত। ভীষণ চমকে গেল কিশোর। মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল শীতল শিহরণ।

পাশের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি হচ্ছে এ সব?'

'কি জানি!' বিড়বিড় করল ছেলেটা। 'কিছু তো বুঝতে পারছি না।'

টানাটানি করে দেখল কিশোর। ছুটাতে তো পারলই না, তারগুলো আরও শক্ত হয়ে এঁটে বসল।

পেছনে তাকাল সে। রবিন আর ফারিহাকে দেখতে পেল ওই সারিতে। ওদের হাতেও তার বাঁধা। উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে দু'জনে। ধারে কাছে কোনখানে দেখতে পেল না মুসাকে।

পেছনের সারিতেই দেখা গেল ব্যানিকে। হাত বাঁধতে দিচ্ছে না। ধস্তাধস্তি করছে কাউন্সেলরদের সাথে। 'দেব না!' চিৎকার করে উঠল সে। 'আমি হাত বাঁধতে দেব না!'

দুই হাত পেছনে নিয়ে গেল সে। সরে যাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু তিনজন কাউন্সেলর চেপে ধরল ওকে। দু'জনে ওর দুই হাত টেনে ধরে রাখল। আরেকজন কব্জিতে তার পেঁচাতে লাগল। চিৎকার করতে থাকল ব্যানি, 'ছাড়ুন আমাকে! ছাড়ুন! এ ভাবে বাঁধার কোন অধিকার নেই আপনাদের।'

'এ তো দেখি গোলমাল পাকানোর ওস্তাদ,' বলে উঠল একজন কাউন্সেলর। 'আই, ছেলে, কি নাম তোমার? তোমাকে চিনে রাখতে হবে।'

'এ রকম করছে কেন ওরা?' ফিসফিস করে পাশে বসা ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আর ব্যানিই বা এমন ভয় পাচ্ছে কেন?'

'জানি না!' ছেলেটা বলল। 'আজব কাণ্ড মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

ভাবনা-চিন্তার বিশেষ সময় পেল না কিশোর। বিশালদেহী কঠোর

চেহারার সাদা ল্যাব কোট পরা একজন মানুষ বেরিয়ে এল ঘরের সামনের দিক থেকে। টেবিলগুলোর কাছে এসে দাঁড়াল। গরিলার হাতের মত দুটো বড় বড় হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে ইশারা করল। নাটকীয় ভঙ্গিতে ষাঁড়ের মত গর্জন করে উঠল, 'স্বাগতম, বন্দিরা!'

অনেকেই হাসল। কিন্তু প্রাণ নেই তাতে। অস্বস্তি বোধ করছে।

দু'জন কাউন্সেলর ছুটে গেল সাদা কোট পরা লোকটার কাছে। হাত তুলে ব্যানিকে দেখিয়ে কি যেন বলল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কঠিন দৃষ্টিতে ব্যানির দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা।

ধূসর রঙের চোখ তার। বরফের মত শীতল। ভোঁতা, মোটা নাকটা দেখে মনে হয় ঘুসি খেয়ে বহুবার ভেঙেছে। গভীর কালো কাটা একটা দাগ এক ভুরুর কাছ থেকে উঠে গেছে কপালের ওপর।

হাত তুলল আবার লোকটা। ঘরটা পুরোপুরি নীরব না হওয়া পর্যন্ত তুলে রাখল। তারপর বলল, 'আমার নাম থিউডর। থিউডর মারকুইস। আমি এখানকার অ্যাসিসট্যান্ট ওয়ারডেন।' ভঙ্গি দেখে মনে হলো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

ওয়ারডেন? নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। ওয়ারডেন তো থাকে জেলখানার।

সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ছড়িয়ে পড়ল থিউডরের ঠোঁটে। ধূসর চোখ মিটমিট করতে থাকল। 'টেরর ক্যাম্পে সবাইকে স্বাগতম।' দুই হাতের তালু ডলল। 'আমি কথা দিচ্ছি, এই গ্রীষ্মে তোমাদের আতঙ্কিত করে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করব।'

'কিন্তু আমাদের হাত বেঁধেছেন কেন?' রাগত স্বরে বলে উঠল একটা ছেলে।

কে কথা বলে দেখার জন্যে ফিরে তাকাল কিশোর। রনি।

'ছাড়ুন আমাদের! ছেড়ে দিতে বলুন!' রনির সঙ্গে সুর মিলিয়ে চিৎকার করে উঠল ব্যানি। 'এ ভাবে আটকে রাখার কোন অধিকার নেই আপনাদের।'

তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে যাবার কম্পন টের পেল আবার কিশোর।

জ্বলন্ত চোখে ছেলে দুটোর দিকে তাকাল থিউডর। 'এই, কি নাম তোমাদের?'

নিজেদের নাম জানাল রনি আর ব্যানি।

'কয় নম্বর কেবিন?' জিজ্ঞেস করল থিউডর।

দ্বিধা করতে লাগল দু'জনে।

'তিন নম্বর,' অবশেষে জবাব দিল ব্যানি।

রহস্যময়, অদ্ভুত হাসি খেলে গেল থিউডরের ঠোঁটে। কপালের কাটা

দাগটা লাফানো শুরু করল। শীতল কণ্ঠে ঘোষণা করল, 'ওটা আমাদের লাকি কেবিন!'

'লাকি' শব্দটার ওপর বিশেষ জোর দিল সে।

সাত

'যাই হোক,' ভারী গমগমে কণ্ঠে ঘোষণা করল আবার থিউডর, 'তোমাদের জন্যে একটা বিশেষ চমক আছে। টেরর ক্যাম্পের মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব এখন। মোট চল্লিশটা ছবি যে মানুষটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভীতিকর-মানবে পরিণত করেছে; এসো, সেই জিম হ্যাগেনকে আমরা টেরর ক্যাম্পে সাতঙ্কে বরণ করি।'

সাতঙ্ক! শব্দ চয়ন কি! ভাবছে কিশোর। হাততালি দেয়ার জন্যে হাত তুলতে গিয়ে দেখে তুলতে পারছে না। তার দিয়ে যে বাঁধা রয়েছে ভুলেই গিয়েছিল।

তবে মুখ খোলা রয়েছে। চিৎকার করে স্বাগত জানাতে কোন বাধা নেই। তা-ই করল বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে।

ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলেন জিম হ্যাগেন। তাঁকে দেখে অবাক হলো অনেকেই। চেপে রাখতে পারল না হতাশা। নানা রকম শব্দ করে ফেলল। দেখতে কেমন হবেন তিনি যে রকম কল্পনা করেছিল ওরা, তার ধারেকাছেও নন তিনি।

প্রথমেই ধরা যাক তাঁর উচ্চতার ব্যাপারটা। অতিরিক্ত খাটো তিনি। থিউডরের কাঁধের চেয়েও দু'এক ইঞ্চি খাটো। শুধু খাটোই নন, রোগাটেও। তাতে আরও বেশি বেঁটে মনে হয় তাঁকে। সরু কাঁধের ওপর ছোট্ট একটা মাথা বসানো। তাতে রেশমের মত পাতলা কুচকুচে কালো চুল। থুঁতনিতে অল্প ক'খানা দাড়ি। ঠিক মাঝ বরাবর দু'চারটাতে পাক ধরেছে।

গায়ে কালো টি-শার্ট। পরনে কালো প্যান্ট। পায়ে স্যান্ডেল। কাঠির মত সরু সরু পা। হাত দুটোও তেমনি সরু।

শার্টের বুকের ওপরে কি যেন একটা চকচক করতে দেখল কিশোর। ভাল করে দেখে বুঝল, রূপার একটা খুদে মড়ার খুলি। চোখ দুটো লাল পাথরে তৈরি।

টেবিলের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে অবাক হয়ে হ্যাগেনের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। পছন্দের মানুষটিকে দেখে আর সবার মত সে-ও হতাশ। এ-কি একটা চেহারা হলো! তা-ও আবার একজন বিখ্যাত চিত্রপরিচালকের!

লম্বা একটা উঁচু টুলের ওপর নিজেকে টেনে তুললেন হ্যাগেন। বোধহয়

সবাই যাতে তাঁকে ভালমত দেখতে পায় সে-জন্যে। এক হাতে একটা ক্লিপবোর্ড। অন্য হাতে দাড়ি চুলকাচ্ছেন। চুপ করে রইলেন তিনি হট্টগোল থামার অপেক্ষায়।

'অনেক ধন্যবাদ তোমাদের, আমাকে এ ভাবে স্বাগত জানানোর জন্যে,' বললেন তিনি। এত নরম আর ফিসফিসে কণ্ঠস্বর তাঁর, শোনার জন্যে গলা টানটান করে কান পেতে দিতে হলো কিশোরকে।

'এটা একটা সাংঘাতিক দৃশ্য আমার জন্যে,' বলতে থাকলেন তিনি। কাঠির মত পায়ের দুই হাঁটুর ওপর নামিয়ে রাখলেন ক্লিপবোর্ডটা। 'থিউডরের কাছে নিশ্চয় তোমরা শুনেছ, মোট চল্লিশটা ছবি আমি বানিয়েছি। কোনটাই পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেনি আমাকে। কিন্তু এবার সুযোগ এসেছে। এই ক্যাম্প হবে আমার বাস্তব পটভূমি। আর তোমরা সবাই অভিনেতা। তোমাদের দিয়ে অভিনয় করাব আমি।'

আনন্দে হুল্লোড় করে উঠল আবার সবাই।

টান দিয়ে বাঁধন খোলার চেষ্টা করল কিশোর। বলল, 'কিন্তু বেঁধে রাখা হয়েছে কেন আমাদের?'

অনেকেই গলা মেলাল তার সঙ্গে। অজস্র প্রশ্নবাণ তুমুল বেগে একযোগে ছুটে যেতে লাগল যেন পরিচালককে লক্ষ্য করে।

কঠোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে সবাইকে চুপ করতে ইশারা করল থিউডর।

দাড়ি চুলকালেন হ্যাগেন। দরাজ ভঙ্গিতে হাসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি আমার দা রিভেঞ্জ অভ ডক্টর ডেমন ছবিটা দেখেছ?'

বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই চিৎকার করে জানাল, দেখেছে।

'তাহলে নিশ্চয় ডক্টরের ভয়মাপক যন্ত্র ফিয়ার মিটারের কথা মনে আছে তোমাদের,' হ্যাগেন বললেন। 'তোমাদের হাতে বাঁধা তারগুলো যুক্ত করা হয়েছে সিনেমার সেই ফিয়ার মিটারের মত দেখতে একটা যন্ত্রের সঙ্গে।'

'কি হবে তাতে?' জানতে চাইল সামনের সারিতে বসা একটা মেয়ে।

'দেখতে চাও? বেশ, দেখাচ্ছি,' জবাব দিলেন হ্যাগেন। শরীর মুচড়ে, বহু কায়দা-কসরৎ করে উঁচু টুলটা থেকে নামলেন তিনি। থিউডরের দিকে ফিরে বললেন, 'একজন ভলান্টিয়ার জোগাড় করো তো।'

গটমট করে টেবিলগুলোর কাছে চলে এল আবার থিউডর। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে দুই আঙুলে টিপে ধরে কোটের হাতার বোতাম ঘোরাচ্ছে। ধূসর চোখের শীতল দৃষ্টি চঞ্চল ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছেলেমেয়েদের ওপর।

জিম হ্যাগেনের ছবির শয়তান ডাক্তারের মতই লাগছে এখন ওকে।

দা রিভেঞ্জ অভ ডক্টর ডেমন ছবিটা দেখেনি কিশোর। ভয়মাপক যন্ত্রটা কেমন হবে ভাবতে লাগল সে।

বিশাল থাবা তুলে কলার মত মোটা তর্জনী তাক করল থিউডর। 'আই ছেলে, তুমি…হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি…গোলমাল বাধিয়েদের একজন…উঠে এসো।'

'না!' চিৎকার করে উঠল ব্যানি। 'না না, আমি যাব না। ফিয়ার মিটার দেখার কোন আগ্রহ নেই আমার।' হাত থেকে তারের বাঁধন ছুটানোর আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করল সে। 'দোহাই আপনাদের! আমাকে ছেড়ে দিন!'

এত ভয় পাচ্ছে কেন ও? অবাক লাগছে কিশোরের।

সবাই ঘুরে গেছে। সব ক'টা চোখের দৃষ্টি এখন ব্যানির ওপর।

রবিন আর ফারিহার দিকে তাকাল কিশোর। ভয় দেখা যাচ্ছে ফারিহার চোখে। রবিনের চেহারায় অস্বস্তি। অনেক পেছনের একটা টেবিলের একধারে মুসাকে দেখতে পেল এখন। কোন কারণে আসতে দেরি করে ফেলেছে বোধহয়। সামনের দিকে সীট পায়নি।

সামনের দিকে ঘুরল আবার কিশোর। একটা কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে থিউডর। পটাপট কয়েকটা বোতাম টিপে দিল। তারপর দেয়ালে বসানো একটা হ্যান্ডেল টান দিয়ে নামিয়ে দিল।

'বাবাগো!' বলে চিৎকার দিয়ে উঠল ব্যানি।

বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের চড়চড় শব্দ স্পষ্ট কানে এল কিশোরের।

ঝাঁকি দিয়ে উঠল ব্যানির দেহ।

পেছনে ছিটকে গেল মাথাটা।

ব্যাঙের মত লাফাতে লাগল সে। শরীর মোচড়াচ্ছে অনবরত। নাচতে শুরু করল দেহটা।

নাচন বন্ধ হতে না হতেই আবার শোনা গেল বিদ্যুতের চড়চড়। আবার ঝাঁকি দিয়ে উঠল ব্যানির দেহ।

চেঁচিয়ে উঠল ছেলেমেয়েরা। আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল যেন সারাটা ঘর জুড়ে।

হেসে উঠল কিশোর। নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনাল হাসিটা। পাশের ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মজা করছে ওরা, তাই না? ভয় দেখিয়ে বিনোদন। এটাও এক ধরনের আনন্দ।'

তার কথার জবাব দিল না ছেলেটা। ব্যানির দিকে তাকিয়ে আছে।

এবার আর বেশিক্ষণ নাচতে পারল না ব্যানি। মাথাটা ঝুলে পড়ল সামনের দিকে।

টেবিলের ওপর ঢলে পড়ে গেল সে। নড়ল না আর।

আট

'বন্ধ করো! বন্ধ করো!' চিৎকার করে উঠলেন হ্যাগেন। লাফ দিয়ে গিয়ে নিজেই কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টিপাটিপি শুরু করলেন।

থিউডরের তেমন কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। যেন ছেলেটা

মরলেই কি, বাঁচলেই কি। ধীরে সুস্থে গিয়ে দাঁড়াল ব্যানির কাছে। কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল।

চিৎকার করে উঠল কয়েকটা ছেলেমেয়ে। বাকিরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। দম আটকে আসছে কিশোরের। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে।

ব্যানিকে তোলার চেষ্টা করছে থিউডর।

'কি অবস্থা ওর?' হ্যাগেন জানতে চাইলেন। 'বেঁচে আছে?'

'মনে হচ্ছে বেঁচে যাবে,' জবাব দিল থিউডর। দু'জন কাউন্সেলরের দিকে তাকাল। 'এই, ওকে এখান থেকে সরাও।'

ব্যানির হাতের বাঁধন খুলে দিল সে। দু'জন কাউন্সেলর এসে ব্যানির নেতিয়ে পড়া দেহটা ধরাধরি করে তুলে নিল। তুলতে বহুত বেগ পেতে হলো ওদের। ফেলেই দিয়েছিল আরেকটু হলে।

ঘরে পিনপতন নীরবতা। ব্যানিকে বয়ে নিয়ে গেল ওরা। একটা দরজার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। লাগিয়ে দিল দরজাটা।

একটা ফায়ারপ্লেসের সামনে পায়চারি করছেন হ্যাগেন। ঘন ঘন দাড়ি চুলকাচ্ছেন। আঙুলের ইশারায় কাছে ডাকলেন থিউডরকে।

'ভোল্টেজ আরও কমিয়ে দাও,' থিউডরকে বললেন তিনি। 'পরের গ্রুপটার ওপর এত ভোল্ট আর ব্যবহার কোরো না।'

দু'হাতের তালু ঘষতে লাগল থিউডর। মুখে শয়তানি হাসি। বলল, 'ভোল্টেজ বেশি হলেই তো মজা।'

পায়চারি থামিয়ে দিলেন হ্যাগেন। থিউডরের মুখের দিকে তাকালেন। 'তুমি যে খারাপ লোক, জানা আছে আমার, থিউডর। কিন্তু এমন কিছু করে বোসো না যাতে তোমাকে কাজ দেয়ার জন্যে পরে পস্তাতে হয় আমাকে।'

হাসিটা চওড়া হলো থিউডরের। 'এমন কিছু করতে বাধ্য করবেন না, যাতে কাজটা নেয়ার জন্যে পরে পস্তাতে হয় আমাকেও।'

বিরক্তির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন হ্যাগেন। 'মনে হচ্ছে তোমাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনেই ভুলটা করেছি আমি। ওটাই তোমার উপযুক্ত জায়গা ছিল। পচে মরতে। একবিন্দু বদলাওনি তুমি।'

বলে কি? জেল থেকে ছাড়িয়ে আনা কয়েদী! ঢোক গিলল কিশোর। এ সব কথা এ ভাবে খোলা জায়গায় বলছেন কেন হ্যাগেন? বুঝতে পারছেন না সবাই শুনে ফেলছে? নাকি কোন কারণে ইচ্ছে করেই শোনাচ্ছেন ক্যাম্পারদের, যাতে উল্টোপাল্টা কোন কিছু করতে সাহস না পায় ওরা।

'ব্যানির কি অবস্থা?' জ্যাকের কথায় বাধা পড়ল কিশোরের ভাবনায়। 'ভাল হবে তো?'

জ্বলন্ত চোখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে থিউডর আর হ্যাগেন। জবাব দিল না।

'হাত খুলে দেবেন আমাদের?' চিৎকার করে বলল কিশোরেরই টেবিলে

বসা একটা মেয়ে। 'আর তো পারি না। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো।'

মেয়েটার প্রশ্ন যেন ঝটকা দিয়ে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল হ্যাগেনকে। যেন মনে পড়ল, সবাই বসে আছে কান পেতে। ওদের সামনে এ ভাবে গোপন কথাগুলো ফাঁস করা উচিত হয়নি। মেয়েটার কথার জবাব দিলেন না তিনি।

'সরি,' হ্যাগেন বললেন। 'আমাদের ক্যাম্পটা নতুন তো। কিছু কিছু গোলমাল আর সমস্যা এখনও রয়ে গেছে!' চোখের পাতা সরু করে থিউডরের দিকে তাকালেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'তোমার মত সমস্যা!'

টকটকে লাল হয়ে গেল থিউডরের মুখ। চাপা গরগর শব্দ বেরিয়ে এল গলার গভীর থেকে, অনেকটা জানোয়ারের মত। কপালের কাটা দাগটা লাফাতে শুরু করল আবার।

আবার ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালেন হ্যাগেন। ভারী গলায় বললেন, 'দা রিভেঞ্জ অভ ডক্টর ডেমন ছবিতে একটা ছেলের বেলায় যা ঘটেছিল, অবিকল একই কাণ্ড ঘটল ব্যানির বেলায়ও। কেমন অদ্ভুত না?'

আবার নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়ে আনমনে মাথা ঝাঁকাতে শুরু করলেন তিনি।

পাগলের মত আচরণ! বেশি বুদ্ধিমান মানুষেরা পাগল হয়ে যায়! ভাবল কিশোর।

যেন তার মনের কথা পড়তে পেরেই গঙ্গা ফড়িঙের মত হাঁচড়ে-পাঁচড়ে গিয়ে টুলটায় চড়লেন আবার হ্যাগেন। সোজা চোখ তুলে তাকালেন কিশোরের দিকে।

'কিছু কিছু ছেলেমেয়ের ধারণা,' জ্বলন্ত দৃষ্টি কিশোরের ওপর স্থির রেখে বলতে লাগলেন তিনি, 'এই ক্যাম্পের অনেক কিছুই ভুয়া। কথাটা একেবারে ভুল না। মজা দেয়ার জন্যে ভুয়া জিনিস কিছু অবশ্যই আছে এখানে। কিন্তু আসল জিনিসও আছে। ভয় দেখিয়ে মজা দেয়ার জন্যে নয়, মজা পাওয়ার জন্যে।'

কে মজা পাবে? আপনি আর থিউডর? ভাবল কিশোর।

'ভুয়া জিনিস দিয়ে ভয় দেখিয়ে সত্যিকারের মজা পাওয়া যায় না,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলে চলেছেন হ্যাগেন। 'আসল মজা পেতে হলে আসল জিনিস ব্যবহার করা দরকার।'

ব্যানির দুরবস্থা চোখের সামনে দেখেছে। হ্যাগেনের কথা আতঙ্ক সৃষ্টি করল ছেলেমেয়েদের মনে। চেঁচানো শুরু করল ওরা:

আমাদের বাঁধন খুলে দিন!

দোহাই আপনাদের, এ ভাবে আটকে রাখবেন না!

বেড়াতে এসেছি আমরা, আতঙ্কিত হতে নয়!

আমাদের সঙ্গে জেলের কয়েদীর মত আচরণ করছেন কেন?

ছেড়ে দিন। প্লীজ! প্লীজ!

কারও কথাই যেন কানে ঢুকছে না হ্যাগেনের। আনমনে বিড়বিড় করেই চলেছেন, 'ভয়। আতঙ্ক। এ সব নাহলে কি চলে? জীবনটা একঘেয়ে হয়ে যায়! তাই, ভয় আমাকে পেতেই হবে…যে ভাবেই হোক…তার জন্যে যদি কাউকে…'

আসল কথাটা বলে ফেলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সামলে নিলেন হ্যাগেন। ধাক্কা খেয়ে যেন বাস্তবে ফিরে এলেন।

আসলেই হ্যাগেনের মাথা খারাপ, মনে হতে থাকল কিশোরের।

নয়

অবশেষে বাঁধন খুলে ছেড়ে দেয়া হলো ওদের।

কেবিনে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। ফারিহা চলে গেল তার কেবিনে। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে সে। কিশোর তাকে সাবধান থাকতে বলল। বলে দিল, বিপদের সামান্যতম সম্ভাবনা দেখলেও যেন দৌড়ে এসে খবর দেয়।

'এক কেবিনে থাকতে পারলে ভাল হত,' মুসা বলল।

'তা তো হতই। কিন্তু থাকা যখন গেল না,' কিশোর বলল, 'কি আর করা। ওর কেবিনের দিকে সব সময় নজর রাখতে হবে আরকি আমাদের।'

ঘরে ঢুকেই ধপ করে বিছানার কিনারে বসে পড়ল মুসা। রবিন গিয়ে শুয়েই পড়ল। চিত হয়ে। কিশোরও বসল বিছানার কিনারে। নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে ঘন ঘন।

'কিশোর, চলো, বাড়ি ফিরে যাই,' মুসা বলল। 'এখানে আমার একদম ভাল্লাগছে না। ভূতের সঙ্গেও বাস করা যায়, কিন্তু পাগলের সঙ্গে যায় না। এখানকার সবগুলো লোক পাগল। বিকৃত মস্তিষ্ক। খুনী হলেও অবাক হব না।'

চুপ করে আছে কিশোর। জবাব দিল না।

'অ্যাই কিশোর, কি বললাম, শুনছ?'

'উঁ?' গভীর ভাবনা থেকে উঠে এল যেন কিশোর। 'শুনছি। রহস্যময় কিছু একটা ঘটছে এখানে। সেটার সমাধান না করে কোনমতেই আমি বাড়ি যাব না।'

'বসে থেকে কি মরবে?'

'মরব কেন? সাবধান থাকব…'

'কি হবে সাবধান থেকে?' উঠে বসল রবিন। 'এই যে ইলেকট্রিকের তার দিয়ে আমাদের হাত বাঁধল, বিদ্যুৎ চালিয়ে দিল ব্যানির শরীরে, কি করতে

পারলাম? সাবধান থেকেও কি ওদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারব?'

'গায়ের জোরে না পারলে বুদ্ধি খাটাব,' জবাব দিল কিশোর। 'যত যা-ই বলো, আমি এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছে হলে চলে যেতে পারো।'

'তোমাকে ফেলে যে যাব না আমরা, ভাল করেই জানো সেটা,' মুসা বলল। 'সে-জন্যেই এ কথা বলতে পারলে।'

'শোনো,' বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, 'অন্য যে কোন ক্যাম্পে ছুটি কাটাতে যেতে পারতাম আমরা। কিন্তু সেগুলোতে এটার মত টানটান উত্তেজনা থাকত না। আর উত্তেজনা ছাড়া, জটিল রহস্য ছাড়া কি গ্রীষ্মের ছুটি জমে?'

একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কিশোর, তাকে আর টলানো যাবে না, জানে মুসা। তবু তর্ক করতে যাচ্ছিল, কিন্তু রনিকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল।

জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল রনি। কপালে ঘাম। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছতে মুছতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ব্যানির খবর কি?'

'ভাল না,' মুখ অন্ধকার করে রেখে জবাব দিল রনি। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। দম নেয়ার জন্যে থামল। বলল, 'দেখতে গিয়েছিলাম ওকে। উল্টোপাল্টা আচরণ করছে। মোটেও ভাল না অবস্থা।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'তার মানে?'

'পাগলের মত কি বলে না বলে ঠিকঠিকানা নেই,' রনি বলল। 'আমার মনে হয়...ওই ইলেকট্রিক শক...মগজটা বিগড়ে দিয়েছে ওর।'

'সত্যি বলছ? ধাপ্পা দিচ্ছ না?'

'একবার দিয়ে তো দেখি সর্বনাশ করলাম! কোন কথাই আর বিশ্বাস করতে চাও না এখন।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল রনি, 'আজ সকালে আসার পর থেকেই যে সব কাণ্ড দেখছি...'

কি দেখেছে জানার জন্যে তার কাছে গিয়ে বসল কিশোর। মুসা আর রবিনও উঠে বসল কিশোরের পাশে।

'ভয়ানক জায়গা এটা। সাংঘাতিক বিপজ্জনক,' রনি জানাল। 'হুঁশিয়ার থাকতে হবে।...আমাদের সন্দেহ করে বসেছে ওরা। নজর রাখবে জানা কথা। কেবিন থ্রী'র ওপর অন্য কারণেও বিশেষ নজর আছে ওদের, বুঝে ফেলেছি। দেখলে না, ব্যানিকে কি করল। আমাকে কি বলল জানো...'

জানালার দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল সে।

কি দেখেছে দেখার জন্যে ঘুরে গেল কিশোর।

থিউডর তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। শীতল, কঠিন দৃষ্টি। আড়ি পেতে কথা শুনছিল।

রনির দিকে ফিরল কিশোর। থরথর করে কাঁপছে বেচারা রনি। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে।

'যা বললাম, বোলো না কাউকে,' কাঁপা স্বরে বলল সে। 'যদি বলো, আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে কিন্তু সাফ অস্বীকার করব।'

'আমরা কাউকে বলে দেব ভাবছ কেন?' অভয় দিল রবিন, 'ভয় নেই। বলব না।'

কিন্তু বিশ্বাস করতে পারল না বোধহয় রনি। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে দৌড় মারল। ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে।

বোকা হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

'অদ্ভুত!' রবিন বলল। 'এ রকম কাণ্ড করল কেন রনি?'

'ভূতে আসর করেছে ওকে!' জানালার দিকে তাকিয়ে বলল মুসা। থিউডরকে দেখা যাচ্ছে না আর এখন।

'বিচিত্র!' নিচের ঠোঁটে জোরে এক টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। নিজেকেই যেন প্রশ্ন করতে লাগল, 'কি বলতে চেয়েছিল রনি? এত ভয় পেল কেন থিউডরকে দেখে?'

কানে এল চিৎকার, 'প্লীজ! ছেড়ে দিন! আমাকে ছেড়ে দিন! প্লীজ!'

দশ

কেবিনের দরজার কাছে ডাইভ দিয়ে গিয়ে পড়ল তিনজনে। সবার আগে বাইরে বেরিয়ে এল কিশোর।

ওর পেছনেই বেরোল মুসা। তারপর রবিন।

পাহাড়ের ওপর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে ব্যানি।

ঘাসের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে সে। এঁকেবেঁকে। ঘোড়ার ডাকের মত শোনাচ্ছে তার গোঙানি মেশানো চিৎকার।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিশোর। তিন জন লোক তাড়া করে যাচ্ছে ব্যানিকে। দু'জন কাউন্সেলর। একজন ক্যাম্পের ডাক্তারখানার নার্স।

ব্যানিকে সই করে ঝাঁপ দিল একজন কাউন্সেলর। মিস করল। উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে।

সাঁই করে পাক খেয়ে ডানে কেটে দৌড় দিল ব্যানি। চিৎকার করছে একনাগাড়ে।

ঢাল বেয়ে ওঠা কঠিন কাজ। কাউন্সেলরদের সঙ্গে দৌড়ে পারল না সে। ধরে ফেলল ওকে।

'ছাড়ুন আমাকে! ছেড়ে দিন! যা দেখেছি এ ব্যাপারে কাউকে কিচ্ছু

বলব না! কসম খোদার!'

কিন্তু ব্যানির চিৎকারে কান দিল না কেউ। টানতে টানতে নিয়ে চলল ওকে দুই কাউন্সেলর।

*

ডিনারের পর কেবিনে ফিরল ব্যানি। শান্ত হয়ে গেছে। এখন ভালই মনে হচ্ছে ওকে। কি ঘটেছিল জিজ্ঞেস করল তাকে কিশোর।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বসল ব্যানি। 'আমি কিছু বলতে পারব না। দোহাই তোমাদের, দয়া করে এ ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না আমাকে।' স্পষ্ট ওর পিঠটা কেঁপে উঠতে দেখল তিন গোয়েন্দা।

আর কিছু বলল না তাকে কিশোর। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, কি দেখেছে ব্যানি? লোকগুলো কেন ওকে তাড়া করেছিল? ধরে নিয়ে গিয়ে কি করেছে?

আলো নিভিয়ে দেয়ার পর নিজের বাংকে উঠে বসল ব্যানি। বহুক্ষণ ধরে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরে। চাঁদের দিকে। বিষণ্ণ। গম্ভীর। নড়া নেই চড়া নেই, পাথরের মূর্তি যেন।

*

পরদিন ভোর থেকেই শুরু হলো বৃষ্টি। ঘর থেকে বেরোতে না পেরে হলঘরে বসে বসে জিম হ্যাগেনের ছবি দেখল ছেলেমেয়েরা। সত্যি চমৎকার। দেখতে দেখতে ব্যানির কথা ভুলেই গেল কিশোর।

লাঞ্চের সামান্য আগে বৃষ্টি থামল। সূর্যের মুখ দেখা গেল। চকচক করছে ভেজা ঘাসগুলো। সব কিছু ধুয়ে মুছে যেন নতুন হয়ে গেছে।

খাওয়ার পর ঘুরতে বেরোল তিন গোয়েন্দা। ফারিহাও চলল ওদের সঙ্গে।

পাহাড়ের ওপর দিকে গেল ওরা। অনেকক্ষণ ঘুরেটুরে ফিরে এল নিচে, বনের ধারে।

লম্বা, সোজা উঠে যাওয়া পাতাবহুল একটা গাছের দিকে নজর পড়তে থমকে গেল মুসা। 'খাইছে! কিশোর, দেখো!'

'কি?'

'ক্যামেরা। ওই যে দেখো।'

তাই তো! চারজনেই দেখতে পেল এখন ক্যামেরাটা। নিচু ডালে বসানো।

'নজর রাখা হচ্ছে নাকি আমাদের ওপর?' রবিনের প্রশ্ন।

'থিউডরের কাজ না তো?' ফারিহা বলল।

'কিংবা জিম হ্যাগেন নিজেই,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'যারাই এই গাছের নিচ দিয়ে যাওয়া-আসা করছে, তাদেরই ছবি তোলা হচ্ছে।'

'কিন্তু কেন তুলবে?' আবার প্রশ্ন করল রবিন।

'জানি না। রহস্যটা জটিল হচ্ছে ক্রমেই।' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। 'চলো, গিয়ে দেখে আসা যাক, মনিটরের সামনে কে বসে আছে।'

খানিক দূরে একটা ময়লা ফেলার ড্রাম। খুটুর-খাটুর শব্দ হচ্ছে ওটার ভেতরে।

কিশোরের দৃষ্টি অনুসরণ করে সবাই তাকাল ড্রামটার দিকে।

ড্রামের ঢাকনা ঠেলে তুলল একটা কালো মাথা।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ওরা।

শব্দ শুনেই হোক বা গন্ধ পেয়ে, মাথাটা উঁচু হলো আবার। ঢাকনাটা ফাঁক হলো অনেকখানি।

একটা জানোয়ার।

চোখ লাল করে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর সাহস হারাল। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল আক্রমণের ভঙ্গিতে। চমকে যে যেদিকে পারল সরে গেল ওরা। এই সুযোগে বনের দিকে ছুটে পালাল জানোয়ারটা।

একটা র‍্যাকুন।

'কি খাচ্ছিল?' ফারিহা বলল। 'মুখে রক্ত দেখলাম মনে হলো।'

'এখানে তো সব কিছুই দেখি চমকপ্রদ,' রবিন বলল।

ড্রামটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। ফাঁক হয়ে থাকা ঢাকনাটার ভেতরে উঁকি দিল। পরক্ষণে ধাক্কা খেয়ে যেন সরে চলে এল ড্রামের কাছ থেকে।

'কি হলো?' মুসার প্রশ্ন।

'মানুষের হাড়গোড়। রক্ত মাখা। মাংসও আছে,' গলা কাঁপছে কিশোরের।

কৌতূহল দমাতে না পেরে সবাই গিয়ে গিয়ে উঁকি দিল ঢাকনার নিচে। কিশোরের মতই লাফিয়ে সরে চলে এল। চিৎকার করে উঠতে গিয়ে মুখে হাত চাপা দিল ফারিহা।

ওখানে দাঁড়িয়ে আলোচনা করল ওরা কয়েক মিনিট। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল কিশোর। 'নাহ্, এর একটা বিহিত করতেই হবে! নিশ্চয় কাউকে খুন করে ড্রামের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। চলো, মিস্টার হ্যাগেনকে জানাইগে।'

*

লজে এসে ঢুকল ওরা। আলো জ্বালানো হয়নি এখনও। বাইরে আলো থাকলেও ভেতরে অন্ধকার। চোখে সয়ে আসার অপেক্ষা করতে গিয়ে খানিকটা সময় নষ্ট হলো।

মিস্টার হ্যাগেনের অফিসটা রয়েছে লম্বা হলের শেষ মাথায়। সেদিকে এগোল ওরা। কাঠের মেঝেতে ওদের জুতোর শব্দ হচ্ছে। যত আস্তেই ফেলার চেষ্টা করুক না কেন, শব্দ হয়েই যাচ্ছে।

সবুজ ইউনিফর্ম পরা দু'জন কাউন্সেলর ওদের পাশ কাটানোর সময়

দাঁড়িয়ে গেল একজন। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর?'

জবাব দিল না কিশোর।

থামলও না ওরা কেউ।

দেয়ালের ধার ঘেঁষে এগোনোর সময় একটা দেয়ালের গায়ে লেখা দেখতে পেল: ক্যাম্প অ্যাসিসট্যান্ট।

নিশ্চয় থিউডরের অফিস, অনুমান করল কিশোর।

তার পরে আরেকটা দরজা দেখা গেল। তাতে লেখা: প্রবেশ নিষেধ।

জিম হ্যাগেনের অফিসের দরজা বন্ধ। ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। পেছনে সরে রইল বাকি তিনজন।

থাবা দেয়ার জন্যে হাত তুলল কিশোর। কিন্তু মাঝপথে আটকে গেল যেন তার হাতটা।

ভেতর থেকে ভেসে আসছে তীক্ষ্ণ, যন্ত্রণাকাতর, আতঙ্কিত চিৎকার।

পর পর দু'বার হলো শব্দটা।

এগারো

লাফ দিয়ে দরজার কাছ থেকে সরে চলে এল কিশোর।

আর কোন শব্দ নেই।

স্তব্ধ নীরবতা।

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল ওরা। কি করবে? পালাবে? নাকি কে চিৎকার করছে জানার চেষ্টা করবে?

ফিরে যাবার বান্দা কিশোর পাশা নয়। ভয় পাচ্ছে বটে, কিন্তু তারপরেও হাত তুলল আবার। যা থাকে কপালে ভেবে দিয়ে বসল থাবা।

নীরবতা।

আবার থাবা দিল সে।

'ভেতরে যে লোক আছে তাতে তো কোন সন্দেহ নেই,' ফারিহা বলল। 'কিন্তু জবাব দেয় না কেন?'

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁক হয়ে গেল পাল্লা। ভেসে এল জিম হ্যাগেনের কণ্ঠ, 'কে?'

ফাঁকের কাছে সরে এল তাঁর মুখটা। আরও কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে গেল পাল্লা।

মাথাটা সেই ফাঁক দিয়ে ঠেলে দিলেন হ্যাগেন।

অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। লাল টকটকে হয়ে গেছে মুখ। কপাল থেকে ঘাম ঝরছে। দাড়ি ভিজে গেছে। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছেন।

'মিস্টার হ্যাগেন,' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি হয়েছে আপনার?'

জবাব দিতে সময় লাগল। জোর করে হাসি ফোটালেন মুখে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘাম মুছলেন কপালের।

'না, কিছু না,' তিনি বললেন। 'সিনেমার জন্যে কিছু স্পেশাল দৃশ্য তৈরি করছি।'

'চিৎকার শুনলাম…' বলতে গিয়ে পায়ে মুসার লাথি খেয়ে 'আঁউ' করে উঠল ফারিহা। চুপ থাকার জন্যে ওকে লাথি মেরেছে মুসা।

কিন্তু শুনে ফেলেছেন পরিচালক। জবাব দিতে দ্বিধা করলেন। 'ও, ওটা। সাউন্ড ইফেক্ট। ওসব চিৎকারের অভাব নেই আমার কাছে। হাজার রকমের চিৎকারের স্টক আছে। যে কোন ধরনের চিৎকার। সিনেমায় লাগে, জানো বোধহয়।'

ওদের দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন, মনে হচ্ছে ওরা বিশ্বাস করতে না চাইলেও করিয়ে ছাড়বেন।

কিন্তু কাজ হলো না। বিশ্বাস করল না কিশোর। চিৎকারটা অনেক বেশি বাস্তব। রেকর্ড করা চিৎকারের মত মনে হয়নি। তা ছাড়া অত ঘামছেন কেন হ্যাগেন? রীতিমত কাঁপছেন। এত উত্তেজনা কিসের?

জানতেই হবে কিসের চিৎকার। হ্যাগেন সতর্ক হওয়ার আগেই আচমকা হাত বাড়িয়ে ঠেলা মেরে দরজাটা আরেকটু ফাঁক করে ফেলল কিশোর।

অফিসের ভেতরে চোখ পড়তে দম আটকে ফেলল ওরা। অদ্ভুত দুটো প্রাণী গুটিসুটি হয়ে বসে আছে দেয়াল ঘেঁষে। কোন্ ধরনের জীব ওগুলো, বোঝা গেল না। তরমুজের মত সবুজ মাথা। চকচকে টাক। গিরগিটির মত লম্বা মুখ। কুচকুচে কালো চোখ। কলসের মত পেট, সবুজ রঙের।

ছেলেমেয়েদের উঁকিঝুঁকি মারতে দেখে বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা নামিয়ে নাক টেনে টেনে শব্দ করতে থাকল ওরা। কি বলতে চায়? এটা কি ওদের কান্না?

অস্ফুট শব্দ কিশোরের মুখ থেকেও বেরিয়ে এল, যখন দেখল জীবগুলোর হাত-পা দেয়ালে আটকানো শিকলের সঙ্গে বাঁধা।

কিশোর যে এ ভাবে দরজা খুলে ফেলবে ভাবতে পারেননি বোধহয় হ্যাগেন, হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। সামলে নিতে সময় লাগল না। তাড়াতাড়ি ঠেলে দিলেন আবার পাল্লা। সামান্য ফাঁক রাখলেন। সেখান দিয়ে মুখ বের করে শীতল কণ্ঠে বললেন, 'কাজটা ভাল করলে না, কিশোর।'

'কিন্তু…ওরা কোন প্রাণী?' কিশোরের মুখ ফসকে বেরিয়ে চলে এল যেন প্রশ্নটা।

'প্রাণী নয়,' সাফ জবাব দিয়ে দিলেন হ্যাগেন। 'আমার বানানো পুতুল। স্পেশাল ইফেক্টের জন্যে বানিয়েছি।' রেগে উঠলেন হঠাৎ, 'নাকি তোমরা ভাবছ কোনখান থেকে আসল দানব ধরে এনে অফিসে বেঁধে রেখেছি?'

'কিন্তু পুতুল হলে বাঁধার দরকার কি?' না বলে পারল না কিশোর। সে-ও ঘামতে শুরু করেছে। গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে কান।

'বললাম না, স্পেশাল ইফেক্ট!' ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে চোখের পাতা সরু করে তাকালেন হ্যাগেন। 'দেখো, গোলমাল পাকানো স্বভাবের, নাক গলানো ছেলেমেয়ে আমার একদম পছন্দ না। তিন নম্বর কেবিন তো তোমাদের? আরও দুটো বদমাশ ছেলের সঙ্গে উঠেছ! ওরাই তোমাদের মাথায় উল্টোপাল্টা চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে, তাই না?'

'কিন্তু...আ-আমরা তো খারাপ কিছু করিনি...'

'করেছ কি করোনি, টের পাবে!...যাকগে, কেন এসেছিলে, বলো এখন।'

আসল কথাটা ভুলেই গিয়েছিল কিশোর। মনে পড়তে বলল, 'আমরা আপনাকে জানাতে এসেছিলাম, ক্যাম্পের একটা ময়লা ফেলার ড্রামের মধ্যে মানুষের হাড়গোড় দেখেছি। রক্তমাখা তাজা হাড়। মাংস লেগে আছে এখনও। র‍্যাকুনে খাচ্ছিল।'

স্তব্ধ হয়ে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন হ্যাগেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখাতে পারবে আমাকে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর, 'পারব!'

কিন্তু আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। ড্রামটা যেখানে ছিল সেখানে গিয়ে আর পাওয়া গেল না ওটা। ক্যামেরাটাও দেখা গেল না গাছের ডালে।

কিন্তু ড্রামটা যে ছিল, তার চিহ্ন দেখতে পেল কিশোর। মাটিতে, ঘাসের ওপর গোল দাগ হয়ে আছে। চাপ লেগে বসে গেছে ঘাসগুলো।

তারমানে, ওরা ওখান থেকে সরার পর পরই সরিয়ে ফেলা হয়েছে ড্রাম আর ক্যামেরা।

বারো

ডিনারের আগে কেবিনে কাপড় বদলাতে গিয়ে রনির সঙ্গে দেখা। সে জানাল আরও কিছু উদ্ভট, ভয়াবহ খবর। স্পিন-অ্যান্ড-স্ক্রীমে চড়তে গিয়ে নাকি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছিল একদল ছেলেমেয়ে। মেশিন চালু করে রেখে চলে গিয়েছিল অপারেটর। ভয়ানক গতিতে ঘুরতে শুরু করেছিল দোলনাগুলো। আতঙ্কে চিৎকার-চেঁচামেচি করে ভীষণ কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল আরোহীরা। অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে ওদের নামিয়ে আনে অপারেটর। মাথা ঘুরে, বমি করে একাকার। অনেকক্ষণ ধরে ঘাসের ওপর পড়ে থেকেছিল ছেলেমেয়েরা। সারতে অনেক সময় নিয়েছে।

কয়েকজন গিয়েছিল ভূতের দীঘিতে সাঁতার কাটতে। ওখানে নাকি

ওদের পা ধরে টেনে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করেছে জলজ ভূতেরা।

পাহাড়ের চূড়ায় বনের মধ্যে যারা গিয়েছিল, তারাও নিস্তার পায়নি। পেত্নীর কান্না শুনে নাকি দেখতে গিয়েছিল কে কাঁদে। ভূতে তাড়া করেছে ওদের। চিৎকার করতে করতে কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

কিশোর জানাল, ওদের অভিজ্ঞতার কথা। র‍্যাকুনের মরা মানুষের মাংস খাওয়ার কথা শুনে তো হাঁ হয়ে গেল রনি। অনেকক্ষণ লাগল তার সামলে নিতে।

*

ডিনারের সময় এক ধরনের সুরুয়া খেতে দেয়া হলো ওদের। খেতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। জিনিসটার স্বাদ ভাল লাগল না তার। রুচিও নষ্ট হয়ে গেছে। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল মরা মানুষের হাড়, রক্ত, মাংস।

খাবারের বাটিতে চামচটা নাড়াচাড়া করতে থাকল কেবল। মুখে তুলল না প্রায় কিছুই। অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছে। ক্যাম্পে এসেছিল আনন্দ করতে। কিন্তু মজার চেয়ে এখানে আতঙ্কই বেশি। স্নায়ুর ওপর একটানা এত প্রবল চাপ সহ্য করা কঠিন।

বোকা বানানো হচ্ছে নাকি ওদের?

বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। তবে কোনও ধরনের শয়তানি চলছে এটা বোঝা যায়।

মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল সে। নীরবে খেয়ে চলেছে মুসা। রবিনের অতটা রুচি আছে বলে মনে হচ্ছে না। ফারিহাও খেতে পারছে না তেমন। কিশোরের সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাসল। অস্বস্তি ভরা হাসি।

সবাই আতঙ্কিত, বুঝতে অসুবিধে হলো না।

ক্যাম্পটায় আসলে কি ঘটছে, বুঝতে পারলে হয়তো অতটা ভয় পেত না। জানা জিনিসের চেয়ে অজানা জিনিসের ভয় অনেক বেশি।

ঘরের সামনের দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখা গেল থিউডরকে। টেবিলের সারির সামনে এসে দাঁড়াল সে। জোরে জোরে চিৎকার করে বলল, 'এই, শোনো সবাই। আমার কথা শোনো। জরুরী কথা।'

মুহূর্তে নীরব হয়ে গেল অতবড় ঘরটা।

'প্লীজ, শোনো সবাই,' থিউডর বলল। 'এইমাত্র খবরটা জানিয়েছে আমাকে বাবুর্চি। বেশ দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে সে। ভুল করে নাকি বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা দিয়ে ফেলেছে সুরুয়ার মধ্যে। তার ধারণা, দুটো প্লেটে রয়েছে ওগুলো। সুরুয়ার স্বাদটা যদি অন্য রকম লাগে কারও কাছে, সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।'

কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করল না। ভাবল, থিউডরের রসিকতা। ওদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে।

একের পর এক হাত ওপরে উঠতে শুরু করল।

'এই যে ভাই, আমারটা লাগছে।'

'আমারটার অদ্ভুত স্বাদ।'

'এহ্হে, এটা কোন্ ধরনের সুরুয়া?'

'আসুন, আসুন, জলদি আসুন আমার কাছে।'

আরও হাসাহাসি।

'আমারটা খারাপ!'

'না না, আমারটা!'

থিউডরকে কেউ পছন্দ করে না। সুযোগ পেয়ে সমানে ইয়ার্কি মারতে শুরু করল।

কিন্তু থিউডর আগের মতই গম্ভীর। 'দেখো, হাসির ব্যাপার নয়,' রাগত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল সে। 'কোন্ প্লেটে খারাপ ব্যাঙের ছাতা দেয়া হয়েছে, অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'তাহলে আসতে এত দেরি করলেন কেন?' বলে উঠল রবিন্। 'খেয়ে তো প্রায় শেষ করে ফেলেছি আমরা। বিষ এতক্ষণে যার পেটে যাওয়ার চলে গেছে।'

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলল থিউডর।

কিন্তু কথা বেরোনোর আগেই গোঙানি শোনা গেল। তারপর ব্যথায় চিৎকার করে উঠল আরেকজন কে যেন।

অন্য সবার সঙ্গে কিশোরও তাকাল সেদিকে। পেট চেপে ধরেছে রনি আর ব্যানি।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল ব্যানি। আতঙ্কে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। পেট চেপে ধরে বাঁকা হয়ে গেল।

জোরে গুঙিয়ে উঠল আবার রনি। 'মাগো, কি ব্যথা! মরে গেলাম, উহ্!'

বাঁকা হয়ে গেল সে-ও। পেট চেপে ধরে সমানে গোঙাতে লাগল।

'মনে হচ্ছে বিষ দেয়া প্লেট দুটো পাওয়া গেছে,' থিউডর বলল। বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর।

ইচ্ছে করে বিষ দেয়া হয়েছে ব্যানি আর রনিকে। দুর্ঘটনা হতেই পারে না এটা। অতিরিক্ত কাকতালীয় হয়ে যায় তাহলে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। থিউডরকে বলল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার হাঁ করে দেখছেন কি? কিছু করুন ওদের জন্যে।'

হাসি মুছে গেল থিউডরের। বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে শুরু করল। মোলায়েম স্বরে জবাব দিল, 'আমার আসতে মনে হয় দেরিটা বেশিই হয়ে গেছে।'

তার কথার সমর্থনেই যেন চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল ব্যানি আর রনি।

তেরো

রাগ আর আতঙ্কিত চিৎকারের বোমা ফাটতে লাগল যেন সারা ঘরে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। ছেলে দুটোর দিকে ছুটল।

কিন্তু সে পৌঁছার আগেই কাউন্সেলররা পৌঁছে গেল। রনি আর ব্যানিকে বয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল পাশের একটা দরজা দিয়ে।

ঘরের সমস্ত দরজা জুড়ে দাঁড়াল এসে ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র প্রহরীর দল। বেরোনোর সমস্ত পথ আটকে দিল।

'গার্ড?' চেঁচিয়ে উঠল কিশোরের পাশে এসে দাঁড়ানো মুসা। 'কে কবে শুনেছে হলিডে ক্যাম্পে গার্ড পাহারা দেয়?'

শীতল, কঠিন চোখে ওদের দিকে তাকাল কাছের দু'জন গার্ড।

'আমাদের বেরোতে দিচ্ছেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

জবাব দিল না গার্ডেরা। পাত্তাই দিল না যেন কথার।

ফারিহা আর রবিনও এসে দাঁড়াল কিশোরদের কাছে।

গার্ডদের বলল কিশোর, 'বাড়িতে ফোন করব আমরা। এখনই।'

দাঁত বেরিয়ে গেল একজন গার্ডের। ভোঁতা স্বরে জানিয়ে দিল, 'সেটা সম্ভব না।'

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। থিউডরকে খুঁজতে লাগল তার চোখ।

অন্য ক্যাম্পাররা চেঁচানো শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে:

'কি পেয়েছেন আমাদের? কয়েদী!'

'এ ভাবে বন্দি করে রাখার কোন অধিকার নেই আপনাদের!'

'ভাল চান তো শিগ্‌গির ছেড়ে দিন!'

'বাড়িতে ফোন করব আমরা!'

কিন্তু কারও কথায় কান দিল না গার্ডরা।

*

অস্ত্রের মুখে সমস্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়ে যার যার কেবিনে ঢোকাল প্রহরীরা। বাইরে থেকে তালা আটকে দিল।

কেবিন থ্রী'র জানালা দিয়ে উঁকি দিল একজন কাউন্সেলর। কঠোর স্বরে আদেশ দিল, 'শুয়ে পড়ো। এক্ষুণি।'

তর্কাতর্কির মধ্যে গেল না কিশোর। মুসা আর রবিনকে যার যার বাংকে শুয়ে পড়তে বলে আলো নিভিয়ে দিল।

'কিশোর, কি করব এখন?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল কিশোর।

'চলো, বেরিয়ে যাই,' রবিন বলল।

'কি করে বেরোবে? দরজায় তালা। জানালায় শিক। বেরোনোর কোন পথ নেই। আর বেরিয়ে যাবই বা কোথায়? তারচেয়ে অপেক্ষা করা যাক। দেখি কি করে ওরা!'

'ঘটনাটা যা ঘটাল না, একেবারে হ্যাগেনের ছবি প্রিজনারস অভ দা রেড ফরেস্টের মত,' মুসা বলল। 'ছবিটার কথা মনে আছে?'

'তা আছে,' জবাব দিল রবিন। 'তবে জীবনে আর কোনদিন জিম হ্যাগেনের ছবি দেখতে যাব না আমি। ঘেন্না ধরে গেছে তার ওপর।'

একটা ঝিরঝির শব্দ কানে আসছে কিশোরের। বলে উঠল, 'শব্দটা কিসের?'

শব্দ লক্ষ করে মুখ তুলে তাকাতেই ছাতে লাগানো একটা ভিডিও ক্যামেরা চোখে পড়ল। ওদের দিকেই তাক করা রয়েছে লেন্সটা। শব্দটা ওটার মোটরের।

'এখানেও নজর রাখছে আমাদের ওপর,' কিশোর বলল।

রেগে গেল মুসা। ক্যামেরাটার দিকে ঘুষি তুলে বলল, 'রাখো, রাখো, যত ইচ্ছে নজর রাখো; কেয়ার করি না আমরা।'

বাংক থেকে মাথা বের করে দিয়ে শূন্য বাংক দুটোর দিকে তাকাল কিশোর।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রবিন আর মুসাও তাকাল।

ফিসফিস করে বলল রবিন, 'রনি আর ব্যানির লাশ দুটোকে কি করেছে ওরা?'

র‍্যাকুনটার কথা মনে পড়ল মুসার। ময়লার ড্রামে ঢুকে মাংস খাচ্ছিল। বলল, 'নিশ্চয় ময়লার ড্রামে ভরে রেখে দিয়েছে বনের ভেতর। লাশ গুম করার ভাল উপায় বের করেছে এরা। আমরা যেটা দেখেছি, কার লাশ ছিল ওটা কে জানে!'

'কিন্তু বুঝতে পারছি না, এই ক্যাম্পটায় কি ঘটাচ্ছে ওরা?' রবিন বলল। 'বইয়ে পড়েছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদি কয়েদীদের ওপর নানা রকম নিষ্ঠুর পরীক্ষা চালাত পাগল জার্মান বিজ্ঞানীরা। জিম হ্যাগেনকেও আমার ওরকমই পাগল বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, কিশোর, এইচ জি ওয়েলসের পাগলা ডাক্তারের মত গবেষণা চালাচ্ছে না তো? মানুষকে হয়তো বিকৃত দানবে পরিণত করার উপায় বের করে ফেলেছে। হ্যাগেনের অফিসের দানব দুটো হয়তো এক সময় মানুষের ছেলেমেয়েই ছিল। ওদের গবেষণার গিনিপিগ হয়ে যারা মরে যায়, তাদের লাশ বুনো জানোয়ারকে খাইয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয় ওরা।'

'হুঁ, তোমার কথাগুলো অবিশ্বাস্য মনে হলেও অবাস্তব নয়,' বাংকে উঠে বসল কিশোর। 'রহস্যটা ভেদ করতেই হবে। আমার বিশ্বাস, সব রহস্যের সমাধান রয়েছে জিম হ্যাগেনের অফিসে। সূত্র খুঁজতে যেতে পারলে ভাল

হত।'

বাংক থেকে নেমে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিল ও। রূপালী জ্যোৎস্নার যেন বাণ ডেকেছে। সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল, ডজনখানেকেরও বেশি সশস্ত্র প্রহরী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে ক্যাম্পের মধ্যে।

হতাশ হয়ে ফিরে এল সে। 'আজ রাতে আর কোথাও বেরোনো যাবে না, ওই গার্ডদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে।'

'কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কি?' কিছুই না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে রাজি নয় মুসা।

'অকারণে বিপদে পড়ার কোন মানে হয় না,' কিশোর বলল। 'তা ছাড়া গার্ডদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোনমতেই এখন যেতে পারব না জিম হ্যাগেনের অফিসে। সকালের জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে আমাদের। হয়তো সুযোগ আসবে তখন।'

খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করে ঘুমিয়ে পড়ল কিশোর। তবে ভাল হলো না ঘুমটা।

অজস্র দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে কোনমতে পার করল রাতটা।

চোদ্দ

রাতে বোধহয় শিশির পড়েছিল। ভেজা ঘাস মাড়িয়ে লজের দিকে চলল ওরা নাস্তা করার জন্যে। লাল টকটকে সূর্যটা ঝুলে রয়েছে যেন বনের গাছপালার মাথার ওপর। ঢালের নিচে, উপত্যকার লেকটার ওপর কালো মেঘ জমছে।

রুক্ষ চেহারার প্রহরীরা কড়া নজর রেখেছে। ওদের প্রতিটি পদক্ষেপও গুণে গুণে দেখছে যেন। রেগে থাকা ভীত ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করে কথা বলছে। হলে ঢোকার মুখেই দরজার ওপরে বসানো একটা ক্যামেরা মেজাজ খারাপ করে দিল আরও ওদের।

পেছন দিকের একটা টেবিলে পাশাপাশি বসল আজ কিশোর, রবিন, মুসা আর ফারিহা। দরজার কাছাকাছি। সুযোগ পেলেই চট করে সরে পড়ার ইচ্ছে কিশোরের। জিম হ্যাগেনের অফিসে আজ তল্লাশি চালাতে বদ্ধ পরিকর সে।

এতবড় ঘরটা, এতজন ছেলেমেয়ে—অন্যদিন কলরব, কোলাহলে মুখর থাকে। আজ নীরব। বাসন-পেয়ালা-চামচের ঠুনঠুন টুংটাং, দু'চারটা কাশি আর নাক টানা ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

কিন্তু ফায়াপ্লেসের কাছে থিউডর দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ল সবাই। রাগত প্রশ্নবাণে তাকে জর্জরিত করার চেষ্টা চলল যেন:

'আমাদের তালা দিয়ে রেখেছিলেন কেন?'

'আমরা কি আসামী?'

'এত গার্ড কেন ক্যাম্পের মধ্যে? জেলখানা নাকি?'

'বাড়িতে ফোন করতে পারব আমরা?'

'বাড়ি যেতে পারব?'

'চুপ করে আছেন কেন?'

'জলদি জবাব দিন!'

'জলদি!'

'জলদি!'

'জলদি!'

'জলদি' শব্দটা সমস্বরে সুর হয়ে উঠল সবার কণ্ঠে। চিৎকার চেঁচামেচিতে কান ঝালপালা হতে থাকল।

পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে থিউডর। ভাবলেশহীন চেহারা। অনেকক্ষণ পর যেন অবশেষে চমক ভাঙল তার। হাত তুলে সবাইকে চুপ করার জন্যে ইশারা করল।

কিন্তু কাউকে চুপ করাতে না পেরে রেগে গেল সে। লাল হয়ে গেল মুখ। কপালের কাটাটা দপ্‌দপ্ করে লাফানো শুরু করল।

'আমরা শুনেছি,' অবশেষে জবাব দিল সে, 'বনের মধ্যে নানা রকম ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটছে। এ মুহূর্তে তোমাদের বেরোনো উচিত হবে না। সময় হোক, আমরাই তোমাদের বের করে দিয়ে আসব...'

বিক্ষুব্ধ চিৎকারে ঢাকা পড়ে গেল থিউডরের কথা। কেউ তার কথা বিশ্বাস করল না। কেউ মানতে চাইল না।

দুই হাত তুলে নাড়তে নাড়তে চিৎকার করে সবাইকে চুপ করানোর চেষ্টা করতে লাগল সে।

কে যেন আধখানা আপেল ছুঁড়ে মারল তার দিকে। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল থিউডর। পেছনের ফায়ারপ্লেসের মধ্যে গিয়ে পড়ল আপেলটা।

মজা পেয়ে চিৎকার করে উঠল ছেলেমেয়েরা। আরও কয়েকটা আপেল উড়ে গেল তার দিকে। এরপর গেল এক বাটি হালুয়া। কোনমতে মাথা বাঁচাল থিউডর। পেছনের দেয়ালে লেগে ভাঙল বাটিটা।

ঘরের সামনের প্রান্ত থেকে থিউডরকে বাঁচাতে দৌড়ে এল প্রহরীরা।

হই-চই হুড়াহুড়ির এই সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর। দ্রুত সরে গেল হ্যাগেনের অফিসের দিকে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল, কেউ লক্ষ করছে কিনা।

গার্ডরা সবাই ছেলেমেয়েদের থামাতে ব্যস্ত। কারও নজর নেই তার দিকে। একটা মুহূর্তও দেরি না করে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল সে। উঁকি দিয়ে দেখল, হ্যাগেন আছে কিনা।

নেই।

এটাই আশা করেছিল সে। থাকলে, এত হট্টগোল শোনার পর নিশ্চয় চুপ করে অফিসে বসে থাকতে পারত না।

ঘরে ঢুকে দরজাটা ঠেলে দিল কিশোর। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ডাকল, 'মিস্টার হ্যাগেন? কোথায় আপনি?'

সাড়া এল না।

আবার ডাকল, 'মিস্টার হ্যাগেন?'

একটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ কানে এল। জানালা খোলা। পর্দা দুলে উঠল আচমকা ঝড়ো বাতাসের ঝাপটায়।

বাজ ডাকার গুড়গুড় শব্দ হলো। তার পরপরই শোনা গেল গাড়ি চলতে শুরু করার শব্দ।

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল।

একটা কালো গাড়ি চোখে পড়ল। খোয়া বিছানো পথে চাকার শব্দ তুলে চলে যাচ্ছে।

ড্রাইভিং সীটে হ্যাগেনকে দেখে অবাক হয়ে গেল। স্টিয়ারিঙের ওপর এমন ভঙ্গিতে ঝুঁকে রয়েছেন তিনি, মনে হচ্ছে পালাচ্ছেন।

দ্রুত পাহাড়ের ঢালের দিকে চলে গেল গাড়িটা। সরে যাচ্ছে ক্যাম্প এলাকা থেকে।

কোথায় গেলেন হ্যাগেন? চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে অফিসের দিকে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। দেয়ালের দিকে তাকাল। সেই অদ্ভুত প্রাণী দুটো নেই আজ।

ডেস্কের দিকে চোখ পড়ল।

কাঁচে ঢাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন টেবিল। কিছুই নেই, শুধু মাঝখানে পেপারওয়েট চাপা দেয়া এক টুকরো কাগজ ছাড়া।

অবাক লাগল কিশোরের। কৌতূহল হলো। কি ওটা? কারও জন্যে রেখে যাওয়া কোন মেসেজ কিংবা নোট?

ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়াল সে।

হাত বাড়িয়ে তুলে নিল কাগজটা।

জোরে জোরে পড়ল:

'আমি পারব না। এতগুলো ছেলেমেয়ের সর্বনাশ আমি কোনমতেই করতে পারব না। জার্মান ক্যাম্পের ডাক্তারগুলোর মত পাষণ্ড হওয়া কোনমতেই সম্ভব না আমার পক্ষে। যেটুকু করেছি, সেটার জন্যেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। মস্ত অপরাধী মনে হচ্ছে। সবার কাছে ক্ষমা চাইছি আমি। গুড-বাই।'

পনেরো

হাঁ করে নোটটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। কিন্তু লেখাগুলো যেন দেখতে পাচ্ছে না আর। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কি বোঝাতে চেয়েছেন হ্যাগেন? ভয়ঙ্কর কিছু, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আস্তে করে আঙুল ফাঁক করে কাগজটা ছেড়ে দিল সে।

পেছনে খুট করে শব্দ হতে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে থিউডর। ঠোঁটের এক কোণ বাঁকিয়ে ব্যঙ্গ করে হেসে টেনে টেনে বলল, 'বা-বা, চমৎকার। চুরি করে অন্যের ঘরে ঢুকে গোপন কাগজপত্র ঘাঁটা হচ্ছে।' পরক্ষণে বদলে গেল মুখের ভঙ্গি। কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই, কি খুঁজছ?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জবাব খুঁজে পেল না কিশোর। তারপর বলল, 'এই... নোটটা...'

ধমকে উঠল থিউডর, 'কি আছে নোটটাতে?'

টেবিলের ওপর থেকে কাগজটা আবার তুলে নিয়ে বাড়িয়ে দিল কিশোর।

পড়ে গম্ভীর হয়ে গেল থিউডর। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে দু'জন প্রহরী। ইশারায় কাছে ডাকল ওদেরকে। ঘাড় কাত করে ইঙ্গিত করল।

ঘরে ঢুকল দুই গার্ড। দু'দিক থেকে কিশোরের দুই হাত চেপে ধরল।

ঝাড়া দিয়ে, শরীর মুচড়ে ছুটানোর চেষ্টা করল কিশোর। কিছুই করতে পারল না। ওরা তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

টানতে টানতে ওকে নিয়ে চলল ওরা। উঁচু বুক-শেলফ থেকে একটা ক্যামেরা ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল কিশোর।

'এই ক্যামেরা কেন বলুন তো?' জিজ্ঞেস না করে পারল না সে। 'সারা ক্যাম্পেই ক্যামেরার ছড়াছড়ি! ঘটনাটা কি?'

'কোন প্রশ্ন নয়,' শীতল কণ্ঠে ধমকে উঠল থিউডর। 'এমনিতেই অনেক বেশি দেখে ফেলেছ।'

টেনে ওকে হলে বের করে নিয়ে আসা হলো।

'গেল কোথায় সবাই?' অবাক হয়ে জানতে চাইল কিশোর।

জবাব পেল না।

আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

'তোমার বন্ধুরা আর বাকি ঝামেলাকারীরা যেখানে গেছে,' জবাব দিল থিউডর। 'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। চমৎকার একটা জায়গায়। তোমার পছন্দ হবে।'

কিশোরের কল্পনায় ভেসে উঠল জার্মান ক্যাম্পের গ্যাস চেম্বারে দলে দলে ইহুদিদের ভরে মেরে ফেলার দৃশ্য। সিনেমায় দেখেছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। জিজ্ঞেস করল, 'ওরা ভাল আছে তো? কি করেছেন ওদের?'

জবাব দিল না থিউডর।

বনের ভেতরের রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল ওকে। শক্ত করে দু'দিক থেকে তাকে ধরে নিয়ে এগোচ্ছে গার্ডেরা।

হেসে বলল থিউডর, 'দেখেশুনে পা ফেলো। সাপের ছড়াছড়ি এখানে।'

সাপের সঙ্গে হাসির মিলটা কোনখানে বুঝতে পারল না কিশোর।

ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নামল হঠাৎ করেই। মুহূর্তে ভিজে গেল কিশোরের চুল, শার্ট। মাটির দিকে কড়া নজর রেখে হাঁটছে সে। সাপের ভয়ে। কান পেতে আছে হিসহিস কিংবা র‍্যাটলস্নেকের লেজের বোতামের শব্দ শোনার জন্যে। কিছুই শোনা গেল না বৃষ্টির শব্দের জন্যে।

পাহাড়ের একটা চূড়ার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। দেয়ালের গায়ে কালো একটা গর্ত। গুহামুখ। উঁকি দিয়ে দেখল কিশোর। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

গুহার মুখের কাছে কাত হয়ে আছে একটা কাঠের সাইনবোর্ড। তাতে লেখা: হারানো আত্মার খনি।

'কি আছে এর মধ্যে?' থিউডরকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আমাকে আবার ঢুকতে বলবেন না তো?'

মাথা ঝাঁকাল থিউডর। 'তা তো বলবই। তোমার বন্ধুরা সব ওখানেই ঢুকে বসে আছে। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

জোর করে কিশোরকে গুহামুখের কিনারে নিয়ে এল গার্ডেরা।

'কিন্তু কি আছে ভেতরে?' জানতে চাইল কিশোর। 'বলছেন না কেন?'

জবাবে এক ধাক্কা দিয়ে ওকে ভেতরে ফেলে দিল গার্ডেরা।

অন্ধকারে হোঁচট খেল কিশোর।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

গড়াতে শুরু করল।

গড়াতে গড়াতে এসে পড়ল নিচে।

কঠিন, শীতল, পাথুরে মেঝে। পাথরের গায়ে ধাক্কা লাগল। চিৎকার করে উঠল নিজের অজান্তেই। খনিটনি হবে, অনুমান করল।

উঠে বসল সে। সারা গা কাঁপছে। দাঁড়ানোর আগে চারপাশে তাকাল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ে না।

গায়ে কাঁটা দিল। বাতাস ভীষণ ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা।

'কেউ আছেন?' চিৎকার করে ডাকল সে। গুহার দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল তার চিৎকার।

'শুনতে পাচ্ছেন?' আবার চিৎকার করে ডাকল সে।

'কে? কিশোর?' সামনে কোনখান থেকে ভেসে এল অতি চেনা কণ্ঠ।

'মুসা? কোথায় তুমি?'

একটা হাত এসে পড়ল কিশোরের কাঁধে। 'কিশোর, তোমাকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।' মুসার হাতটা ধরল কিশোর। বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আছে। মরা মানুষের হাত এ রকম ঠাণ্ডা হয়। চমকে গেল। মনে পড়ল গুহাটার নাম 'হারানো আত্মার খনি'। জিজ্ঞেস করল, 'আর কে কে আছে তোমার সঙ্গে?'

'সবাই আছি,' জবাব দিল রবিন। 'আমি আছি, ফারিহা আছে, ব্যানি, রনি...'

'ওরা এল কোত্থেকে?'

জবাব পাওয়ার আগেই কানে এল একটা গরগর শব্দ। বাঘ! চিতা! নাকি নেকড়ে?

আবার শোনা গেল গরগর। পরক্ষণে বিকট গর্জন।

ষোলো

একসঙ্গে চিৎকার শুরু করল অনেকগুলো ভীত কণ্ঠ।

'কি-ক্কি ওটা?' গলার কাছে উঠে চলে এসেছে যেন কিশোরের হৃৎপিণ্ডটা। এমন জোরে জোরে লাফ মারছে যেন বেরিয়ে চলে আসবে।

'নেকড়ে!' ভয়ে ভয়ে বলল মুসা। 'ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে।'

'এত অন্ধকার,' রনি বলল। 'দেখতেও তো পাচ্ছি না কিছু। পারলে হয়তো...'

'এই, দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বাধা দিয়ে বলল ব্যানি, 'টর্চ একটা আছে আমার কাছে। ভুলেই গিয়েছিলাম। হাত থেকে ফেলে দিয়েছিল একজন কাউন্সেলর। তুলে পকেটে ভরে ফেলেছিলাম।'

গর্জনটা শোনা গেল আবার। দম আটকে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। আলো জ্বলার অপেক্ষায়।

জ্বালতে অনেক সময় লাগিয়ে দিল ব্যানি।

তীব্র আলো এসে পড়ল কিশোরের চোখে।

এতক্ষণ অন্ধকারে থাকতে থাকতে হঠাৎ আলো পড়ায় রীতিমত ব্যথা করে উঠল চোখ। বন্ধ করে ফেলল সে। ধীরে ধীরে মেলল আবার।

প্রথমেই চোখ পড়ল জিম হ্যাগেনের হাসিমুখের দিকে। জনাকীর্ণ একটা ঘরে বসে আছেন তিনি।

শূন্য খনির গহ্বর নয় এটা। মস্ত একটা হলঘর। কাউন্সেলর আর গার্ডে বোঝাই। ফোল্ডিং চেয়ারে বসে রয়েছে সব। হাঁ করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল

গোয়েন্দারা। সেটা দেখে মজা পেয়ে হাততালি দিয়ে হাসতে শুরু করল ওরা।

জিম হ্যাগেনও হাসছেন। 'ওয়ান্ডারফুল! সত্যি চমৎকার!'

জোরে জোরে মাথা ঝাড়তে লাগল কিশোর। ভাবল, দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। কিংবা কোন ধরনের ঘোর। এটা বাস্তব হতে পারে না।

'সাংঘাতিক অভিনয় করেছ তোমরা! বাস্তব অভিনয়!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন হ্যাগেন। উঠে এসে কিশোরের হাত ধরে জোরে জোরে ঝাঁকি মারলেন। 'ওয়ান্ডারফুল! ওয়ান্ডারফুল! এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলে তোমরা, একেবারে নিখুঁত!'

কাউন্সেলর আর গার্ডরা হেসেই চলেছে।

পেছনের দেয়ালের কাছে দাঁড়ানো থিউডরের দিকে ঘুরে তাকালেন হ্যাগেন। 'ক্যামেরাগুলো কি এখনও চলছে? এবার ওগুলো বন্ধ করে দিতে পারো। স্পীকারটাও বন্ধ করো। নেকড়ের গর্জন আর শোনানোর দরকার নেই।'

আবার গোয়েন্দাদের দিকে ফিরলেন চিত্র পরিচালক। 'রনি আর ব্যানি, আমাদের স্পেশাল ধন্যবাদ রইল তোমাদের জন্যে। তোমরা খুব বড় অভিনেতা। সিলেকশনে ভুল হয়নি আমার।'

'অভিনেতা! কি বলছেন?' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

আবার অনেকগুলো হাততালি।

মাথা নুইয়ে বাউ করল রনি আর ব্যানি।

'অভিনয়টা সত্যিই খুব ভাল হয়েছে তোমাদের,' হ্যাগেন বললেন। 'সবাইকেই এমন বোকা বানান বানিয়েছ। কেউ কল্পনাই করতে পারেনি তোমরা স্টাফ মেম্বার, আমাদের লোক, ক্যাম্পার নও।'

খপ করে রনির হাত চেপে ধরল কিশোর। 'তোমরা অভিনয় করেছ?'

মাথা ঝাঁকাল ব্যানি। হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুখে।

'যা যা ঘটতে দেখেছি, তার কোনটাই আসল নয়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ইলেকট্রিক শক? ফুড পয়জনিং, কোনটাই না?'

হাসিটা ছড়িয়ে গেল রনির মুখে। মাথা নাড়ল। 'ভয়ানক বোকা বনেছ তুমি, কিশোর পাশা।'

হ্যাগেনের দিকে তাকাল কিশোর। 'দীঘির দানো, পাহাড়ের ভূত, সব তাহলে মিথ্যে? ফাঁকিবাজি?'

হেসে মাথা ঝাঁকালেন হ্যাগেন। 'ড্রামের মধ্যে মানুষের মাংস খেতে দেখেছ যে র‍্যাকুনকে, সেটাও সাজানো। হাড়গোড়গুলো প্লাস্টিকের কঙ্কাল থেকে খুলে নেয়া। রক্ত আর মাংস অবশ্য আসল, ভেড়ার। এমন করে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল, তোমরা মনে করেছ মানুষের।'

'থিউডরও তাহলে অভিনয় করেছে বলতে চান?'

আবার মাথা ঝাঁকালেন হ্যাগেন। 'হ্যাঁ। যা কিছু ঘটেছে ক্যাম্পে, সবই সাজানো। সব অভিনয়। র‍্যাকুনটাও পোষা।'

রাগে আগুন ধরে গেল যেন কিশোরের মাথার মধ্যে 'কিন্তু কেন? কেন করেছেন এত সব?'

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'কেন ঠকিয়েছেন আমাদের?'

সুর মেলাল রবিন, 'কেন ভয় দেখিয়েছেন?'

অবাক হওয়ার ভান করলেন হ্যাগেন। 'আমি তো মনে করেছিলাম বুঝেই ফেলেছ তোমরা। সারা ক্যাম্পের যেখানে সেখানে এত এত ক্যামেরা দেখেছ। ভয়ের ছবির জন্যে বাস্তব দৃশ্য গ্রহণ করার প্ল্যান করেছিলাম আমি। ভয় দেখিয়ে, ধোঁকা দিয়ে বাস্তব অভিনয় আদায় করতে চেয়েছিলাম। আমি সফল। বরং অতিরিক্ত সফল। এতটা হব ভাবিনি। আমার নতুন ছবিটায় এ সব দৃশ্য যোগ হবে। পর্দায় নিজেদের দেখে আনন্দ পাবে তোমরা।'

'আপনি...আপনি...' রাগে কথা হারিয়ে ফেলছে কিশোর। 'শুধু কয়েকটা দৃশ্যের শট নেয়ার জন্যে এ ভাবে মানসিক নির্যাতন করেছেন এতগুলো ছেলেমেয়েকে!'

হাসিটা মুছে যেতে শুরু করল হ্যাগেনের। 'কিন্তু আমি তো এর মধ্যে দোষের কিছু দেখছি না। যদি মনে করো, অভিনয়ের জন্যে পারিশ্রমিক দেয়া উচিত আমার, নির্দ্বিধায় দিয়ে দেব। কত চাও বলো?'

'টাকার লোভ দেখাবেন না আমাদের, মিস্টার হ্যাগেন। শুধু বলতে চাই, কাজটা আপনি ঠিক করেননি।'

হাত তুললেন হ্যাগেন। 'আহা, এত রাগছ কেন? রাগার কি আছে? জেনেই এসেছ, এটা টেরর ক্যাম্প। ভয় দেখিয়ে মজা দেয়া হবে, ব্রশুয়ারেও লিখে দেয়া হয়েছে। মজা হিসেবেই নাও ব্যাপারটা।'

কিন্তু কিছুতেই বুঝতে চাইল না গোয়েন্দারা। তাদের এক কথা, ঠকানো হয়েছে। এ ভাবে ভয় দেখানোর কোন অধিকার নেই হ্যাগেনের। ইত্যাদি ইত্যাদি।

হ্যাগেন বললেন, 'যা হবার হয়ে গেছে। এখন থেকে আর কোন ভয় দেখানো হবে না। তোমরা ফ্রী। নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াও ক্যাম্পের সর্বত্র। যা ইচ্ছে করো। চুটিয়ে আনন্দ করো। কোন বাধা নেই।'

'বাকি সবাই কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর। 'অন্য ক্যাম্পাররা?'

'যার যার কেবিনে ফিরে গেছে।'

সতেরো

কেবিনে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। তাদের সঙ্গে ফারিহাও এল কেবিন থ্রী-তে। রাগ একবিন্দু কমেনি ওদের।

'কিছু একটা করা উচিত আমাদের,' মুসা বলল। 'এ ভাবে

ছেড়ে দেয়া যায় না। বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে ওরা। বেরিয়ে গিয়ে পত্রিকায় সব জানিয়ে দেয়া দরকার...'

ফারিহার চোখ বড় বড় হয়ে যেতে দেখে থেমে গেল মুসা। ফিরে তাকাল জানালার দিকে।

আগের বারের মত ঠিক একই ভঙ্গিতে উঁকি দিয়ে দেখছে থিউডর।

কুঁচকে গেল মুসার ভুরু।

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল কিশোর।

পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল থিউডর।

'এখন তো সব শেষ,' রবিন বলল। 'এখন আর আমাদের ওপর চোখ রাখছে কেন থিউডর?'

মুসা বলল, 'দেখোগে, আবার কোন্ শয়তানির মতলব।'

*

লাঞ্চের পর ঘুরতে বেরোল ওরা।

বনের মধ্যে ঢুকল। পায়েচলা পথ চলে গেছে। উঁচুনিচু। পাথরের ছড়াছড়ি।

সাপের কথাটা ভাবল কিশোর। একটা সাপও দেখেনি এখানে আসা পর্যন্ত। নিশ্চয় এটাও মিথ্যে বলেছে থিউডর। ভয় দেখানোর জন্যে।

ঘুরে-টুরে বেরিয়ে এল ওরা বন থেকে।

স্পিন-অ্যান্ড-স্ক্রিমটাতে চড়ে মজা করল খানিক। পালতোলা নৌকায় করে দীঘিতে বেড়িয়ে এল ঘন্টাখানেক। শেষ বিকেলে নামল সাঁতার কাটতে।

*

কেবিনে ফিরে কাপড় বদলে লজে ডিনার সারতে চলল কিশোর।

আজ আর কোন আতঙ্ক নেই। নেই অস্বস্তি। কিশোর যখন ঢুকল, গোগ্রাসে হট ডগ গিলছে সবাই। ওকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল কয়েকজন। কেউ কেউ হেসে, কেউ বুড়ো আঙুল তুলে স্বাগত জানাল।

কিশোর বুঝল, তিন নম্বর কেবিনের খবর চাউর হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

কাউন্টার থেকে একটা প্লেট তুলে নিয়ে হট ডগ নেয়ার লাইনে দাঁড়াল কিশোর। রনি আর ব্যানিকে খুঁজছে তার চোখ। কোথাও দেখা গেল না ওদের।

সামনের একটা টেবিল থেকে ওর দিকে হাত নাড়লেন হ্যাগেন। তাঁকে ঘিরে বসেছে কাউন্সেলররা। পাশেই একটু দূরে বসা থিউডর। সামনে খাবারের প্লেটে স্তূপ করা খাবার।

ফারিহার কাছে এসে বসল কিশোর। তার কেবিনের আরেকটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে ফারিহা।

হট ডগ খেতে খেতে দরজার দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। 'মুসা এখনও আসছে না কেন?'

ফারিহা চুপ করে তাকিয়ে রইল কিশোরের দিকে। কিছু বলল না।

খানিক পরে জোরে জোরে আবার বলল কিশোর, 'হলো কি মুসার? আসে না কেন?'

কথাটা কানে গেল হ্যাগেনের। মুখ ফিরিয়ে তাকালেন তিনি।

উদ্বিগ্ন হয়ে ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল কিশোর, 'এত দেরি করছে কেন?'

আশেপাশের কয়েকজন ছেলেমেয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল তার দিকে।

'কেবিনেই আছে হয়তো, দেখোগে,' থিওডর বলল। 'সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছে তো। কাহিল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডেকে নিয়ে আসা উচিত ছিল তোমার।'

'উঁহু, ঘুমায়নি,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'এ ভাবে ঘুমিয়ে পড়ার মানুষ নয় ও, বিশেষ করে খাওয়া বাদ দিয়ে। অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে। যাই তো। দেখে আসিগে।'

'দাঁড়াও,' হ্যাগেনও উঠে দাঁড়ালেন। 'আমিও যাচ্ছি। চলো।'

হ্যাগেনের জন্যে দাঁড়াল না কিশোর। আগে আগে বেরিয়ে এল। ওকে ধরার জন্যে দৌড়ে আসতে হলো ছোটখাট মানুষটাকে।

কেবিনের দিকে চলেছে দু'জনে।

দূর থেকেই দেখা গেল কেবিনের দরজাটা খোলা। বাতাসে নড়ছে।

দ্রুত খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর আর হ্যাগেন।

ভেতরে উঁকি দিয়েই আঁতকে উঠল কিশোর, 'সর্বনাশ! সব এ রকম উলট-পালট করে দিয়েছে কে?'

তছনছ করে দেয়া হয়েছে সমস্ত কেবিনটা। বাংক থেকে টেনে মাটিতে ফেলা হয়েছে চাদর, কম্বল সব কিছু। দলা-মোচড়া হয়ে পড়ে আছে ওগুলো। মাটিতে উল্টে পড়ে আছে একটা ড্রেসার। ড্রয়ার খোলা। ভেতরের জিনিসপত্র কাপড়-চোপড় সব মাটিতে লুটাচ্ছে। একটা জানালার শিক বাঁকানো। শার্সির কয়েকটা কাঁচ ভাঙা।

মনে হচ্ছে ওখান দিয়েই দানবীয় শক্তিতে সব ভেঙেচুরে ঘরে ঢুকে তছনছ করে দিয়ে গেছে কেউ।

স্তব্ধ হয়ে গেছেন হ্যাগেন।

অবশেষে ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে মারামারি বাধিয়েছিল দুটো দানব!'

'শান্ত হও! শান্ত হও!' হ্যাগেন বললেন, 'আমার মনে হয় ভয়ের কিছু নেই...'

'ভয়ের কিছু নেই তো ঘরটার এ অবস্থা করল কে? কেন করল?'

হ্যাগেনের পাশ কাটিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকল কিশোর। খুঁজতে খুঁজতে নিচু হয়ে বাংকের নিচ থেকে কি যেন তুলে নিল।

'কি ওটা?' জানতে চাইলেন হ্যাগেন।

তুলে ধরল কিশোর। 'চিনতে পারছেন না? মুসার ঘড়ি!' কিশোরের কণ্ঠে আতঙ্ক। 'কখনও হাত থেকে খোলে না এটা ও! ঘুমানোর সময়ও না!'

'আ-আ-আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না!' এতক্ষণে ভয় দেখা দিল হ্যাগেনের চোখে। 'এ রকম তো হওয়ার কথা না! ছবির শূটিং শেষ। আমি তো সব বন্ধ করে দিতে আদেশ দিয়েছি।'

'তাহলে মুসা গেল কোথায়?' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

আঠারো

ঢোক গিললেন হ্যাগেন। 'আমি...আমি কিছু জানি না! সত্যি বলছি!' বাইরের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন তিনি। 'চিন্তা কোরো না। ওকে খুঁজে বের করবই। যাবে কোথায়? কাছাকাছিই নিশ্চয় আছে।'

পকেট থেকে বাঁশি বের করে লজের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে ফুঁ দিলেন কয়েকবার।

দৌড়ে এল সাত-আটজন কাউন্সেলর।

'চোরাবালির গর্তে পড়ে যায়নি তো?' আচমকা বলে উঠল কিশোর।

মাথা নাড়লেন হ্যাগেন। 'উঁহু। পড়লেও কিছু হবে না। ওটা আসল চোরাবালির গর্ত নয়। নকল। বানানো। ওখানে পড়লে কারও কিছু হবে না।'

কাউন্সেলরদের দিকে ফিরে আদেশ দিলেন তিনি, 'খোঁজো সবখানে। মুসাকে খুঁজে বের করো।'

ওরা সব রওনা হওয়ার আগেই দৌড়াতে দৌড়াতে এল ফারিহা। 'কিশোর ভাই, রবিন ভাইও তো নেই। সে-ও খেতে যায়নি এখনও।'

ভয়ে কেঁদেই ফেলল ফারিহা। থরথর করে কেঁপে উঠল।

তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলেন হ্যাগেন। 'থাক থাক, শান্ত হও। এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? ওরা নিশ্চয় দীঘির পাড়ে হাওয়া খেতে গেছে।'

ফারিহাকে শান্ত থাকতে বলছেন, কিন্তু পরিচালক নিজেই শান্ত থাকতে পারছেন না। গলা কাঁপছে তার। ঘাবড়ে গেছেন, সন্দেহ নেই। কাউন্সেলরদের খুঁজতে যেতে বলে সবার আগে নিজেই দৌড় দিলেন।

দৌড়াতে দৌড়াতে পাহাড় বেয়ে উপত্যকায় নেমে চললেন তিনি। পেছন পেছন ছুটছে কিশোর আর ফারিহা।

কেবিনগুলো সব অন্ধকার। জোরাল বাতাস ক্রমাগত শিস কেটে যাচ্ছে লম্বা ঘাসের বনে। চাপ দিয়ে নুইয়ে দিচ্ছে ঘাসের মাথা।

গোধূলীর ধূসর আলোয় দেখা যাচ্ছে এখন চরাটা। কেউ নেই। একদম

নির্জন।

আর সহ্য করতে পারল না ফারিহা। 'মুসা ভাই, রবিন ভাই, কোথায় তোমরা!' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল। ওর মন এমনিতেই খুব নরম। অজানা আতঙ্কে অস্থির হয়ে গেল।

বালির চরায় নেমে গেলেন হ্যাগেন। জুতোর খোঁচায় বালি ছড়িয়ে পড়ল।

'অন্ধকারও হয়ে গেল,' বিড়বিড় করতে লাগলেন তিনি। 'দেখা যাচ্ছে না ভালমত...আচ্ছা, সাঁতার জানে তো ওরা?'

'খুব ভালমত,' জবাব দিল কিশোর।

'এই দেখো দেখো!' চিৎকার করে উঠল ফারিহা। নিচু হয়ে বালি থেকে কি যেন তুলে নিল।

'কি ওটা?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যাগেন। 'অ, শার্ট। কার?'

'রবিন ভাইয়ের!' আবার ফুঁপিয়ে উঠল ফারিহা।

হাঁ হয়ে গেলেন হ্যাগেন। 'বলছ, সাঁতার জানে। তারমানে পানিতে ডুবে মরার ভয় নেই। তাহলে?'

'কি করেছেন ওকে, বলুন?' চিৎকার করে উঠল ফারিহা। 'আবার কি করতে গিয়েছিলেন। নিশ্চয় আপনার কোনও ভুলের জন্যে পানিতে পড়ে ডুবে মরেছে ওরা!'

মস্ত দীঘির কালো পানির দিকে তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দিল হ্যাগেনের। বাতাসে ঢেউ উঠেছে।

'সিন্দুক নেই তো ওর মধ্যে?' ফারিহার প্রশ্ন।

'সিন্দুকটা আবার কি জিনিস?' বুঝতে পারলেন না হ্যাগেন।

'অ, এত এত ভূতুড়ে ছবি বানান, আর সিন্দুক কি জিনিস জানেন না? ওগুলোও এক ধরনের দানো। সিন্দুকে বেশি টাকা-পয়সা-মোহর রাখলে জিনের আসর হয় ওগুলোতে। পানিতে গিয়ে নামে তখন। কেউ পানিতে নামলেই লম্বা শেকল দিয়ে পা পেঁচিয়ে ধরে টেনে নিয়ে যায়। দীঘির পার কিংবা চরা থেকেও মানুষকে টেনে নিয়ে যেতে শোনা গেছে।'

চট করে নিচের দিকে তাকালেন হ্যাগেন। পিছিয়ে গেলেন কয়েক পা। যেন দীঘি থেকে শেকল উঠে তার পা পেঁচিয়ে ধরবে ভয়েতে।

'উঁহু, ওসব বানানো গল্প। রূপকথা।' মাথা নেড়ে বললেন তিনি, কিন্তু গলায় জোর নেই। 'এ রকম কিছু ঘটার কথা নয় এখানে।...চলো, ফিরে যাই। অন্য কোথাও খুঁজিগে। বনের ভেতরও গিয়ে থাকতে পারে।'

ফেরার পথে রীতিমত বিলাপ করতে করতে চলল ফারিহা।

কিশোরেরও মন খারাপ। ভয়ানক গম্ভীর। ভঙ্গি দেখে মনে হলো, পারে তো হ্যাগেনের মুণ্ডু চিবিয়ে খায়।

'এখনই পুলিশকে ফোন করব আমি,' ভরসা দেয়ার জন্যে বললেন হ্যাগেন। 'ভয় পেয়ো না। ওরা এসে ঠিকই খুঁজে বের করতে পারবে...'

স্পিন-অ্যান্ড-স্ক্রিমটাকে ঘুরতে দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

ধীরে ধীরে ঘুরে চলেছে কারগুলো। মচমচ, ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হচ্ছে।

'ওটা আবার চালাল কে?' হ্যাগেন বললেন। 'কি সব ঘটা শুরু করেছে জায়গাটায়?'

ঘুরন্ত জিনিসটার দিকে এগিয়ে গেল তিনজনে।

'ওই তো মুসা!' একটা কারের দিকে হাত তুলে চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'মুসা! ওখানে কি করছ?'

জবাব দিল না মুসা।

হাতল টেনে মেশিন বন্ধ করে দিলেন হ্যাগেন।

ধীরে ধীরে গতি কমে আসতে লাগল কারগুলোর।

দৌড়ে কাছে গেল তিনজনে।

মুসার কারটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু কোথায় মুসা?

তার কাপড়গুলো এমন ভাবে পড়ে আছে কারের মধ্যে, দূর থেকে মুসাই পড়ে আছে মনে হয়েছে।

উনিশ

চিৎকার করার জন্যে মুখ খুললেন হ্যাগেন। বেরোল শুধু ঘড়ঘড় শব্দ। টলতে টলতে পিছিয়ে গেলেন তিনি।

তাঁর হাত খামচে ধরল ফারিহা। জোরে জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করতে লাগল, 'থামান এ সব! বন্ধ করুন! উহ্, আর সহ্য করতে পারছি না! আর কত ভয় দেখাবেন আমাদের? এখনও আপনার সেই ছবির জঘন্য শূটিং চালিয়ে যাচ্ছেন!'

'না না, বিশ্বাস করো,' করুণ হয়ে উঠল হ্যাগেনের চেহারা। 'কসম খেয়ে বলতে পারি। আমার শূটিং শেষ। আমি আর কিছু করছি না। মুসা আর রবিন কোথায় গেছে জানি না আমি।'

'জানেন না তো কিছু করুন!' রেগে গেল কিশোর। 'হাওয়ায় তো আর মিলিয়ে যেতে পারে না দুটো জলজ্যান্ত মানুষ। আপনি যা-ই বলেন না কেন, মিস্টার হ্যাগেন, আর আপনাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি আর থিউডর মিলে আবার কোন নাটক করছেন। গুহা থেকে বেরিয়ে আসার পরেও আমাদের কেবিনের জানালায় উঁকি মারছিল থিউডর।'

'ও এমনিই হয়তো গিয়েছিল, তোমরা ভাল আছ নাকি দেখতে...'

'এমনি গিয়েছিল, না! আপনার কোন কথাই আর বিশ্বাস করি না আমরা।'

'বেশ, পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছি আমি। তাহলে তো বিশ্বাস করবে? এসো আমার সঙ্গে' লজের দিকে ছুটলেন তিনি। ছুটতে ছুটতে বললেন, 'এখনকার এই উধাও হওয়াটা বাস্তব। এটা সিনেমা নয়। তারমানে গুজবই সত্যি হলো। কল্পনাই করতে পারছি না আমি...'

'কিসের গুজব?' ধরে বসল কিশোর

'এই ক্যাম্পের জায়গাটা যখন ভাড়া নিই, স্থানীয় অনেকে সাবধান করেছিল আমাকে--এখান থেকে রাত দুপুরে নাকি মানুষ হাওয়া হয়ে যায়।'

'সেটা তো রাত দুপুরে। কিন্তু ওরা হারিয়েছে রাতের আগে। আমি ওসব গুজব বিশ্বাস করছি না। এর পেছনে মানুষের হাত আছে।'

হ্যাগেনের পেছন পেছন ছুটে লজের হলরুমে ঢুকল কিশোর আর ফারিহা। খাওয়া তখন শেষ। পর্দা টানিয়ে ছবি চালানো হচ্ছে। হ্যাগেনের ছবি। বসে বসে সিনেমা দেখছে ছেলেমেয়েরা। পর্দায় দৈত্যাকার একটা পিঁপড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা ছেলেকে। আতঙ্কে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করছে ছেলেটা।

এ সব দেখার মুড নেই এখন কিশোরের। হ্যাগেনেব পিছু পিছু তাঁর অফিসের দিকে চলল।

সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন হ্যাগেন। ডেস্কের সামনের দুটো চেয়ার দেখিয়ে কিশোর আর ফারিহাকে বসতে বললেন।

'চুপ করে বসো। শান্ত হও। যা করার পুলিশ এসে করবে,' রিসিভার তুলে নিতে নিতে বললেন হ্যাগেন।

'আরি!' রিসিভারটা নামিয়ে এনে অবাক হয়ে একটা মুহূর্ত ওটার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। দ্রুত হাতে বোতাম টিপলেন কয়েকবার। আবার কানে লাগালেন রিসিভার।

চোখ তুলে তাকালেন কিশোরদের দিকে। চোখে স্পষ্ট আতঙ্ক। 'ডেড!' কোনমতে শব্দটা যেন ফসকে বেরিয়ে এল তাঁর মুখ থেকে।

চেয়ারে নেতিয়ে পড়লেন তিনি। 'উহ্, খোদা! সহ্য করতে পারছি না আর! কে করছে এ সব?'

বিশ

'চুপ করে থাকলে তো হবে না!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'আরেকটা ফোনে চেষ্টা করুন। পুলিশের সাহায্য এখন জরুরী!' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে তার।

ছুটে ঘরে ঢুকল দু'জনে কাউন্সেলর।

একজন বলল, 'কোথায় আছে ওরা, মনে হয় বুঝতে পেরেছি!'

'কোথায়?' আবার চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'ওদের গলা শুনে এলাম,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কাউন্সেলর। 'মৃত্যুগুহা থেকে। যেখানে ঢুকলে আর ফেরে না কেউ!'

'তোমারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!' ধমকে উঠলেন হ্যাগেন। 'ওটা যে আসল নয় তুমিও জানো। তা ছাড়া ওখানে যাবেই বা কি ভাবে? কে রেখে এল?'

'ওসব প্রশ্ন পরেও করা যাবে,' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'চলুন চলুন, আগে বের করে আনি!'

অফিস থেকে বেরিয়ে হল থেকে বেরোনোর দরজার দিকে ছুটল ওরা। বেরোতে যাবে, এগিয়ে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল বিশালদেহী একজন মানুষ। আবছা অন্ধকারেও চেনা গেল তাকে। থিউডর।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কথা পরে,' জরুরী কণ্ঠে বললেন হ্যাগেন। 'টর্চ নিয়ে এসো আগে। মৃত্যুগুহায় যাচ্ছি আমরা।'

নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল থিউডরের। তারপর চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। টর্চ আনতে ছুটল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বনের ভেতর এসে ঢুকল দলটা। পাহাড়ের ওপর দিকে চলেছে। আগে আগে নাচছে টর্চের আলো। বনে ছাওয়া ঢালের গায়ে একটা বড় গুহা । মৃত্যুগুহা।

যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। পড়ে থাকা মরা গাছের ডাল ডিঙিয়ে, ঝোপ মাড়িয়ে, পাথরে পা হড়কাতে হড়কাতে এগিয়ে চলল ওরা। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় আর লতাপাতা এত বেশি ঘন, এগোনোই বড় কষ্টকর। এ জায়গায় জঙ্গলের দৃশ্যের শূটিং করেন হ্যাগেন।

ঝিঁঝির সম্মিলিত কর্কশ ডাক কান ঝালাপালা করছে। চারপাশে ছোট ছোট জানোয়ারের হুটোপুটি।

অবশেষে চোখের সামনে বেড়ে উঠতে লাগল পাহাড়ের কালো দেয়াল। গুহামুখটা দেখা গেল। দেয়ালের গোড়ায় ফুট দুয়েক উঁচু থেকে শুরু হয়েছে।

মুখের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সবাই। ভেতরে উঁকি দিল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

কাউন্সেলরের দিকে তাকালেন হ্যাগেন। 'কি, তুমি নাকি ওদের গলা শুনেছ? কোথায়?'

'সত্যি শুনেছি,' লোকটা বলল। 'আপনাকে খবর দেয়ার তাড়া না থাকলে নেমে দেখেই যেতাম।'

'এখন নামতে অসুবিধে কি?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'না, কোন অসুবিধে নেই,' হ্যাগেন বললেন। 'এই, একটা টর্চ দাও তো আমার হাতে।'

প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে দশ-বারো গজ নেমে আসার পর সমান হলো গুহার মেঝে। এটা সুড়ঙ্গ। আসল গুহাটা আরও সামনে।

টর্চের আলো পড়ল সামনের দুই পাশের পাথুরে দেয়ালে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

'গুহামুখের কাছে কথা শুনলে কিভাবে?' হ্যাগেন জিজ্ঞেস করলেন। 'কাউকে তো দেখছি না।'

'কথা বলেই ভেতরে চলে গেছে নিশ্চয়,' কাউন্সেলর বলল অনিশ্চিত কণ্ঠে।

'গাধা আর কাকে বলে!' ধমকে উঠলেন হ্যাগেন। 'তোমাদের কথা শোনানোর জন্যে গুহামুখের কাছে এসেছিল। তারপর আবার গিয়ে লুকিয়েছে। এই বলতে চাও?'

'না, তা না...'

'কথা থাক। এগোও। ভেতরে না দেখে যাব না।'

মুসা আর রবিনের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে চলল ওরা। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

একুশ

বেশ কিছুদূর এগোনোর পর সামনে মৃদু গোঙানি শোনা গেল। হালকা ভাবে ভেসে এসে লাগল কিশোরের কানে।

লাফিয়ে উঠলেন হ্যাগেন। তিনিও শুনেছেন।

তারপর শোনা গেল ফোঁপানোর শব্দ। অসহায় হয়ে বসে বসে কাঁদছে যেন কেউ।

'কে কাঁদে?' দম আটকে ফেললেন হ্যাগেন। 'এই, কথা বলো! কে কাঁদছ? কি হয়েছে? আমরা তোমাদের উদ্ধার করতে এসেছি।'

ব্যাটারি লাগানো লণ্ঠন জ্বলে উঠল মাথার ওপর। তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল সবার। ওপর দিকে তাকাল।

দেয়ালের গায়ে একটা বেদিমত জায়গায় উঠে বসে আছে মুসা আর রবিন। পরনে জিনস, গায়ে ক্যাম্পের ছাপ মারা সোয়েটশার্ট।

'মৃত্যুগুহায় স্বাগতম, মিস্টার হ্যাগেন,' হাসিমুখে সমস্বরে বলে উঠল মুসা আর রবিন। 'কথা দিচ্ছি, এখান থেকে কোনমতেই বেরোতে দেব না আপনাদের!'

হেসে উঠল কিশোর আর ফারিহা।

স্তব্ধ হয়ে গেছেন হ্যাগেন আর থিউডর। মুখ হাঁ। চোখ বড় বড়।

'আপনার ঋণটা শোধ করে দিলাম আমরা, মিস্টার হ্যাগেন,' হাসিমুখে

বলল কিশোর।

'তারমানে···তারমানে···পুরোটাই তোমাদের সাজানো নাটক!' বিশ্বাস করতে পারছেন না হ্যাগেন। 'মুসা আর রবিন গায়েব হয়নি?'

'হয়েছিল,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ইচ্ছে করে।'

'ধাপ্পাবাজি!' দুর্বল কণ্ঠে বিড়বিড় করল থিউডর। মুসা আর রবিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই শার্ট পেলে কোথায়? এগুলো ক্যাম্পের জিনিস। রনি আর ব্যানিকে সাপ্লাই দেয়া হয়েছিল।'

'ধার নিয়েছি আমরা,' হেসে জবাব দিল মুসা। 'ওদের কাছ থেকেই।'

'পেছন থেকে ভূতের তাড়া খেয়ে এমন ছোটা ছুটল আপনাদের দুই স্পেশাল চামচা,' হাসতে হাসতে বলল রবিন, 'কি আর বলব! শেষে ভূতের হাতে ওদের কাপড়-চোপড় সব তুলে দিয়ে তারপর বেঁচেছে। এখন নিশ্চয় ক্যাম্পে ফিরে দায়ের আগায় করে নুন খাচ্ছে। রক্তআমাশা যাতে না হয়ে যায়।'

হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল ফারিহা আর তিন গোয়েন্দা।

প্রচণ্ড রেগে গেলেন হ্যাগেন। নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না আর। রাগে কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভূত সেজে ওদের তোমরা ভয় দেখিয়েছ।···শুধু ওদের না, আমার সঙ্গেও তোমরা রসিকতা করেছ! ভয় দেখিয়েছ! ধোঁকাবাজি করেছ···'

'হ্যাঁ, করেছি,' নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, 'সেটা আপনিই আমাদের শিখিয়েছেন। আপনাকে বোঝানোর প্রয়োজন ছিল, আমাদের সঙ্গে কি জঘন্য আচরণ আপনি করেছেন। ছবি বানাতে গিয়ে নিজের কথাটাই শুধু ভেবেছেন। স্পেশাল ইফেক্টে পুতুলকে ব্যবহার করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন আপনি। মানুষ যে পুতুল নয়, না জানিয়ে তাদের ব্যবহার করা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা, মাথায়ই ঢোকেনি আপনার। সে-জন্যেই ঢোকানোর ব্যবস্থা করলাম। এ ভাবে ভয় পেতে কারোরই ভাল লাগে না, মিস্টার হ্যাগেন।'

এক মুহূর্ত থেমে দম নিয়ে আবার বলল কিশোর, 'তবে সব আপনার অনুকরণে করলেও একটা জিনিস আমরা বাদ দিয়েছি। আপনার ভয় পাওয়ার মুহূর্তগুলো মুভি ক্যামেরায় ধরে রাখিনি। সেগুলো তুলে রেখে দর্শকদের দেখালে কি ভাল লাগত আপনার?'

-: শেষ :-